আলাহর বাণী আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

[বাংলা]

القرآن كلام الله والعلوم العصرية

[اللغة البنغالية]

মোহাম্মদ ওসমান গনি

محمد عثمان غني

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
আবুল কালাম আনোয়ার
সানাউল্লাহ বিন নজির আহমদ

مراجعة : عبد الله شهيد عبد الرحمن
أبو الكلام أنور
ثناء الله بن نذير أحمد

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

200٨ -142٩

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

৪৫. সমস্ত বিশ্বজগৎ এক আলাহর সৃষ্টি
৪৬. দুনিয়াতে আমাদের অবস্থান
৪৭. কে আমাকে দুনিয়ায় এনেছেন?
৪৮. যার কিছুই নেই সে অপরকে দিতে পারে না।
৪৯. যার অস্তিত্ব নেই সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না।
৫০. তৈরি কৃত বস্তুর প্রতি গবেষণা-কারিগরের দক্ষতা প্রকাশ ঘটায়।
৫১. প্রকৃত ঈমান
৫২. ঈমান বাড়ে ও কমে।
৫৩. মূ'মনদের প্রতি আলাহর অঙ্গিকার
৫৪. মূ'মেনের হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য
৫৫. আলাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষের একান্ত জরুরি।
৫৬. রাসূলগণের মাধ্যমে আলাহর পরিচয়।
৫৭. আলাহর নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য
৫৮. তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মূ'মিন হও

القرآن كلام الله والعلوم العصرية

আলাহর বাণী আল-কুরআন
ও
আধুনিক বিজ্ঞান

محمد عثمان غني

মোহাম্মদ ওসমান গনি

আরবী ভাষা কোর্স (ফাস্ট ক্লাস)
বি. এ অনার্স (তাফসীর,ফাস্ট ক্লাস) উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, সৌদী আরব।
এম, এ (ফাস্ট ক্লাস) এম, ফিল (এক্সেলেন্ট) দারুল ইহ্‌সান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ডাইরেক্টর, ইয়াতীম বিভাগ, আই, আই, আর, ও, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد...

পবিত্র কুরআন শাশ্বত, তার বাণী চিরন্তন এবং এটি সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মূ'জেযা। এ কুরআন দিয়েই সর্ব শেষ নবি মুহম্মদ সা.-কে প্রেরণ করা হয়েছে, শক্তিশালী করা হয়েছে তার নবুয়তকে। এ কুরআনই হচ্ছে তার ধর্মের প্রথম প্রমাণ। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ তার মধ্য থেকে নতুন নতুন অনেক তত্ত্ব ও উপাত্ত আবিষ্কার করা হচ্ছে, যা তার নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। কী সাহিত্যের উপাদান, কী সামাজিক নীতি ও আদর্শ, কী রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা, সব কিছুই রয়েছে এ কুরআনের মধ্যে। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

ما فرطنا في الكتاب من شئ (سورة الأنعام ٣٨)

আমি এই কিতাবে কোন কিছু লিখতে বাদ দেইনি। (সূরা আনআম : ৩৮)

বলতে দ্বিধা নেই, এ গ্রন্থটি এককভাবে বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি, তাই একে একটি বিজ্ঞানের গ্রন্থ মনে করা ঠিক হবে না। হ্যা, এ কুরআন হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ। এতে বিজ্ঞানের বিস্তারিত বর্ণনা নেই বটে, তবে মহাবিশ্বের আদিলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান উলেখযোগ্য অনেক ঘটনা ও উপাখ্যানের বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে, যা স্বয়ং আলাহ তাআলার তরফ থেকে। মূলত এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আলাহ তাআলার পক্ষ থেকে। মানব জাতির কল্যাণকর সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে এতে-কোন সন্দেহ নেই।

আলাহ বলেন,

تبيانا لكل شيء (سورة ا لنحل.٨٩)

তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা । (সূরা নাহল ৮৯)

অন্যত্র বলেন,

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل (الكهف /٥٤)

নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়ে দিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয় । (সূরা কাহাফ ৫৪)

তাই মহান আলাহ মানব জাতিকে এই কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে দেখার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েছেন। যেন বিজ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত মানুষের বিবেক পবিত্র কুরআনকে বাস্তবতার আলোকে যাচাই বাছাই করে এর সত্যতাকে নিরেট সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে আল-কুরআনের কৃতিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। কুরআনের মধ্যে বর্ণিত বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আলাহ তাআলা এ যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ব নবীর মাধ্যমে আল-কুরআনকে সরাসরি মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন, সে সাথে দিয়েছেন তাদেরকে ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা। সে বুদ্ধি ও বিবেকের সঠিক ব্যবহার করে এ কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই একজন মানুষ সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে। আর কেবল এর মাধ্যমেই বিভ্রান্তির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে ইহকালীন ও পরকালীন চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। রাসূল সা. এর উপর নাজিলকৃত এ কুরআন-ই হচ্ছে চিরন্তন, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম একটি জীবন বিধান। ইহকাল ও পরকালের শান্তি এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল-কুরআন ও রাসূল সা. এর আদর্শ অনুসরণ ব্যতীত কোন বিকল্প পথ নেই।

যদিও আমি কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নই, তবে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা আমি ছোট থেকেই পছন্দ করতাম। আর সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম তখন, যখন তা কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হত। তাই সৌদী আরবে মক্কা মোকাররমার 'উম্মুল কুরআন বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যয়নকালে আমার মনোনীত বিষয় হিসেবে কুরআনের তাফসীরকে গ্রহণ করি। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে কুরআন যে চির সত্য, মহান স্রষ্টার বাণী, তা প্রমাণিত হচ্ছে। তারই কিছু বাস্তব উদাহরণকে সামনে রেখে, বিভিন্ন তাফসীর, পত্র পত্রিকার তথ্য ও বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতায় আলাহর নামে বইটি আমার মাতৃভাষার পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিচ্ছি। এমতাবস্থায় সর্ব প্রথম সৃষ্টিকর্তা আলাহর সাহায্য কামনা করছি এবং দৃঢ়তার সাথে এ ঘোষণা দিচ্ছি যে, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সকল কৃতিত্ব মহান স্রষ্টার। মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার আকুল আবেদন কোথাও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন মনে করলে, দয়া করে আমাদের জানাবেন। ইন্‌শা আলাহ আপনাদের পরামর্শ স্বাদরে গ্রহণ করা হবে।

আমার লিখিত ও অনুদিত ২৪ বইয়ের মধ্যে 'ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান' এবং 'মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞানে'র প্রতি প্রথম থেকেই সম্মানিত পাঠক সমাজের যে আগ্রহ দেখেছি, তা আমাকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী প্রেরণা দিয়েছে এবং এ কাজের প্রতি আমাকে আরো আগ্রহী করে তুলেছে। পরিশেষে তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাকে এ কাজে সাহায্য করেছেন। আলাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

মোহাম্মদ ওসমান গণি

বাণী ও দু'আ

বিস্‌মিলাহির রাহমানির রাহীম

তরুণ আলেম ও লেখক মাওলানা মুহম্মদ ওসমান গণীর দীর্ঘ শ্রম ও অধ্যবসায়ের সারমর্ম "আলাহর বাণী আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান" বইটি আমি পড়েছি। পবিত্র কুরআনই যে সকল মানব হিতৈষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার বা মৌলিক সূত্র তা পবিত্র কুরআনেই একাধিকবার আলাহপাক উলেখ করেছেন। কিন্তু আমরা যারা সাধারণত ধর্মীয় আবেগ বা জ্ঞানে কুরআন অধ্যয়ন করি তাদের কাছে পবিত্র কুরআনের সেই জ্ঞানভাণ্ডার কখনোই উন্মোচিত হয় না। শুধুমাত্র কুরআন বর্ণিত (উলুল-আলবাব) বা গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণই পবিত্র কুরআনের সেই বিজ্ঞানময় আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে সক্ষম।

লেখক তাঁর এই বইটিতে পবিত্র কুরআনের সেই সকল বিজ্ঞানময় আয়াতের প্রকৃত অর্থ যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আলাহপাক লেখকের এই প্রয়াস কবুল করুন।

ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধই অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের আওতাধীন। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত বা বিষয়ই বৈজ্ঞানিক যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রমাণিত। প্রয়োজন এগুলোর ব্যাখ্যা করা। আলোচ্য গ্রন্থ সেই অনুদ্‌ঘাটিত বিষয়াদির দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বইটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকটই গ্রহণযোগ্য হবে। এবং পবিত্র কুরআনই যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এই বাস্তবতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এই বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা।
তাং-১৪.০৬.২০০৬

বাণী ও দুআ

প্রশংসা শুধু মহান স্রষ্টা আলাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি গোটা বিশ্বের মালিক ও প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুলাহর উপর। যার প্রতি নাজিল হয়েছে চিরন্তন মু'জেযা হিসেবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন। যার মধ্যে রয়েছে মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধান। বর্তমান যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও চর্চার মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই মহা গ্রন্থ আল-কুরআন আলাহর বাণী। কেননা বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারের ইঙ্গিত রয়েছে আল-কুরআনে। বিজ্ঞানের অভিনব তথ্যগুলো অতি চমৎকার ভাবে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন নবীন লেখক মোহাম্মদ ওসমান গণি। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে জনাব ওসমান গণি রচিত 'আলাহর বাণী আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ইতিপূর্বে তার লেখা 'ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান' এবং 'মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান' বই দুটি পাঠকদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। আলাহর কাছে এই দোয়াই করছি, যেন তার লিখনির শক্তি আরও বৃদ্ধি করে দেন। আমার বিশ্বাস এই বইগুলো বর্তমান আধুনিক সমাজে পাঠককুলের নিকট সমাদৃত হবে। ইন্‌শা আলাহ।

ম,ই,গণি
প্রফেসর মুহম্মদ ইসলাম গণী
অধ্যক্ষ : সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া
ঢাকা।

কুরআন নাজিলের পূর্বের যুগ

সর্ব প্রথম সেই মহান করুণাময় আলাহ তা'আলার সার্বিক প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী প্রেরণ করেছেন, এবং সর্ব উৎকৃষ্ট কিতাব দান করেছেন, এবং ইসলামকে আমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। সেই মহানবী সা. এর উপর দরুদ ও সালাম যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন।

কুরআন নাজিলের পূর্ব যুগকে জাহেলিয়াত যুগ বলা হয়। জাহেলিয়াত আরবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে অজ্ঞতা। জাহেলিয়াত ইসলামের বিপরীত। ইসলাম বুঝতে হলে জাহেলিয়াতকে বুঝতে হবে, প্রবাদে আছে,

"من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام "

যে ব্যক্তি জাহেলিয়াত জানতে পারেনি সে ইসলাম জানতে পারেনি।

জাহেলিয়াত বলতে সাধারণত যা বুঝায় তা হচ্ছে ইসলাম আগমনের পূর্বের যুগ, যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। তবে প্রশ্ন হলো চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বের সেই যুগকে কেন জাহেলিয়াতের যুগ বলা হতো? সেই যুগের মানুষকে কেন জাহিল বলা হতো? আসলেই কি তারা শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে এতই পিছপা ছিল, যার কারণে তাদের নাম হলো জাহিল?

ইতিহাসের পাতা যদি উল্টিয়ে দেখা যায়, তবে সকলকে এক বাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, সেই যুগেও শিক্ষাদীক্ষার চর্চা ছিল। তাদের ভাষা ও কবিতা গুলোতে এতো উচ্চাঙ্গতা, ভাবের গাম্ভীর্যতা ও অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গি ছিল, যা দেখে পরবর্তী যুগের কবি সাহিত্যিকদের হিমশিম খেতে হয়। এমন কি তাদেরকে লক্ষ্য করে কুরআনের চ্যালেঞ্জ এটাই প্রমাণ করে যে তারা মূর্খ ছিল না। কিন্তু তারপরও সেই যুগকে কেন জাহেলিয়াতের যুগ বলা হতো? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে আমাদেরকে নজর দিতে হবে আলাহর কিতাব পবিত্র কুরআনের দিকে। কারণ হলো আরবী ভাষায় এবং জাহেলিয়াত শব্দটি সর্ব প্রথম কুরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে। আলাহ তা'আলা বলেন:

وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال إنكم قوم تجهلون (سورة الأعراف ١٣٨)

আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করে দিয়েছি। তখন তারা এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, যারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি পূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা, তাদের যেমন অনেক গুলি মাবুদ রয়েছে তেমন আমাদের জন্য একজন মাবুদ বানিয়ে দাও। তিনি (মুসা আ:) বললেন: নিশ্চয়ই তোমরা জাহিল সম্প্রদায়। অর্থাৎ প্রকৃত মাবুদের পরিচয় লাভে তোমরা অজ্ঞ ও মূর্খ।

সুরা আল ইমরান ১৫৪ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে:

• يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية (سورة العمران١٥٤)

তারা আলাহর সম্পর্কে জাহেলিয়াত যুগের ধারণার ন্যায় মিথ্যা ধারণা করছে।

সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে:

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (سورة المائدة ٥)

তারা কি জাহেলিয়াত যুগের হুকুম কামনা করে। আলাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম হুকুম দাতা আর কে হতে পারে?

আলাহর হুকুম ছাড়া যত হুকুম রয়েছে সব জাহেলিয়াত। সূরা আল ফাতাহ এর ২৬ নং আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে:

إذ جعل الذين كفرو في قلوبهم الحمية , حمية الجاهلية (سورة الفتح٢٦)

কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জিদ পোষণ করত।

সুরা আহজাবের ৩৩ নং আয়াতে উলেখ আছে ঃ

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي (سورة الأعراب ٣٣)

জাহেলিয়াত যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (অর্থাৎ সেই যুগে বিস্তৃত ছিল নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা।)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, জাহেলিয়াত যুগের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার যুগ বলা হতো। বৈশিষ্ট্য গুলো হলো:

(ক) الجهل بحقيقة الإله : আকীদাগত দিক দিয়ে প্রকৃত মাবুদের পরিচয়ে তারা ছিল অজ্ঞ।

(খ) الجهل بحكم الله : আইন গত দিক দিয়ে তারা আলাহর হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল।

(গ) চরিত্র গত দিক দিয়ে তাদের অন্তরে ছিল জেদ ও গর্ব।
(ঘ) পরিবেশ গত দিক দিয়ে তাদের ছিল নির্লজ্জতা ও বেহায়পনা।
আয়াত গুলোতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে এরপরও আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। যে সময় আবার সে যুগের ন্যায় উক্ত অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, সে যুগকেও জাহিলিয়াতের যুগ বলা হবে। বলাবাহুল্য বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের সর্বত্র সে অজ্ঞতারই জয়জয়কার, বরং অধুনা সারা পৃথিবী জুড়েই তার প্ররাদূর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
সে জাহেলী সমাজে প্রকৃত মাবুদের সঠিক পরিচয় জানা না থাকার কারণে তারা মূর্তি, গাছ, ও আগুনের পূজা করত। তেমনি বর্তমান চাক্যচিক্যময় চোখ ধাঁধানো পৃথিবীতে প্রকৃত মাবুদের পরিচয় ভুলে গিয়ে কেউ করছি মাজার পূজা, কেউ করছি নেতার পূজা, কেউ করছি ভণ্ড পীরের পূজা, কেউ করছি নফছের পূজা, আবার কেউ করছি শয়তানের পূজা।
সেই জাহেলী সমাজ আলাহর আইন বা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আলাহর হুকুম ছাড়া সমস্ত কানুন হচ্ছে জাহেলী কানুন।
বর্তমানেও আলাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে দেশ ও জাতি শাসন করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলা আরও বলেন,

ألم تر إلي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به (سورة النساء ٦٠)

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। তারা বিরোধীর বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাগুদকে মান্য না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নিছা-৬০
জাহেলী সমাজ ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা জেদের বশীভূত হয়ে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতো।
আর বর্তমানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য অথবা জেদের বশীভূত হয়ে, এক দল অন্য দলের সাথে, এক দেশ অন্য দেশের সাথে যুদ্ধ করছে। তাদের মাঝে মারামারি, যুদ্ধ বিগ্রহ হতো লাঠি সোঁটা, তলোয়ার, বলম দ্বারা, আর এখন হচ্ছে রাইফেল, বন্দুক, মেশিনগান ও পারমাণবিক বোমার দ্বারা।
বর্তমান যুগে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা আইয়্যামে জাহেলিয়াতের চেয়েও একধাপ এগিয়ে।
তখন নারী হাইজ্যাক হতো ঘোড়ার লাগাম টেনে, আর এখন হচ্ছে গাড়িতে করে ও হুন্ডা হাঁকিয়ে।
তখন নারী নির্যাতন হতো জ্যান্ত সমাহিত করে, যা কেবল অত্যাচারই ছিল, আর এখন নারী স্বাধীনতার নামে নারী জাতিকে চরম ভাবে অপমানিত করা হচ্ছে, রাজ পথে টেনে এনে, পালাক্রমে ধর্ষণ করে, অ্যাসিড মেরে, ক্ষত বিক্ষত করে, বিদেশে পাচার করে, লাইসেন্স দিয়ে পতিতালয়ে নিক্ষেপ করে, বিষ প্রয়োগ করে, শ্বাস রুদ্ধ করে অথবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন করে।
তারা আঙ্গুর ও খেজুরের তৈরী অপরিশোধিত মদ খেত। আর এখন অভিজাত হোটেল, রেস্তরাঁ ও ক্লাবে পরিশোধিত ও উন্নত মদ চলছে।
তারা মা'বুদের নৈকট্য লাভের জন্য সন্তানদেরকে হত্যা করত, আর এখন নেতাদের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শত শত মানুষ খুন করা হচ্ছে।
এরপরও কি আমরা বলতে পারি যে আমাদের সমাজ জাহেলী সমাজ নয়? এই জাহিল সমাজ থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে সব কিছুর ইবাদত থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আলাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে।

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه .ذلك الدين القيم (سورة يوسف ٤٠)

আলাহ ছাড়া কারও বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই, তিনি আদেশ দিয়েছে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। সুরা ইউসুফ ৪০ আয়াত।
পৃথিবীতে একটি মাত্র পথ যা আলাহর দিকে নিয়ে যায়, আর অন্যান্য সকল পথ আলাহর দিকে নিতে পারে না, তারা নিয়ে যায় আলাহর বিরুদ্ধে।

إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه .ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (سورة الأنعام ١٥٣)

নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। সূরা আনআম -১৫৩
পৃথিবীতে একটি মাত্র শরীয়ত যা আলাহর শরীয়ত। এছাড়া যা কিছু আছে তা হচ্ছে শয়তান ও প্রবৃত্তির অনুশাসন।

ثم جعلنك علي شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوآء الذين لا يعلمون (سورة الجاثية ١٨)

এরপর আমি তাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অন্যান্যদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। (সূরা জাসিয়া-১৮)

পৃথিবীতে একটি মাত্র পথ সত্য, এ ছাড়া যা রয়েছে তা হচ্ছে ভ্রান্ত। সত্যের পরে গোমরাহি ছাড়া কি রয়েছে? সুতরাং তোমরা কোথায় ঘুরছ? অতএব আসুন জাহেলিয়াতের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে আলাহর বিধান পুরোপুরি অনুসরণের চেষ্টা করি। শয়তানের পদাংক দূরে ফেলে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলি।

কুরআন কি?

কুরআন আলাহর বাণী, জিবরাইল আলাই হিসালামের মাধ্যমে ওহি আকারে মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ। এ কুরআন আলাহর কালাম, মানব জাতির কথার সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই। যে ব্যক্তি এই কুরআন গভীর ভাবে শ্রবণ করবে এবং চিন্তা ভাবনা করবে, সে জানতে পারবে যে, কোন মানুষ কখনই এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসতে পারবে না।

আরবরা হচ্ছে সঠিক শব্দ নিরূপণ ও বর্ণনা নৈপুণ্যের অধিকারী, আর তাই আলাহ তা'আলা তাদেরকে এই কুরআনের মত অনুরূপ অথবা দশটি সূরা অথবা এর মত একটি সূরা নিয়ে আসার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। আর এই চ্যালেঞ্জ এ জন্যই করা হয়েছে যে, আলাহর কালামের মত কখনই মখলুক রচনা করে নিয়ে আসতে পারবে না। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এ কুরআন। এ কুরআনের রয়েছে প্রচুর প্রভাব, যা মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। এমনকি যারা আরবী ভাষা জানে না, কিন্তু যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তাদের অন্তর ভয় ও বিনয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিছু অনারব ও অমুসলিমদেরকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে, আমরা যখন কুরআন শ্রবণ করি তখন আমাদের অন্তর ভীত হয়। কেউ কেউ বর্ণনা করে, যখন আমি কুরআন শ্রবণ করি তখন ভয়ে আমার শরীরের পশম শিউরে উঠে।

কুরআন মু'জেযা হওয়ার আরও প্রমাণ এই যে, আলাহ তা'আলা এটি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই সেই কুরআন যা বর্তমানে মুসলিমদের নিকট রয়েছে। এই কুরআন মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর একটি অক্ষরের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অতএব কুরআন এখানে যেমন, পূর্ব পশ্চিম দিগন্তেও তেমন এবং সব খানে একভাবেই পাঠ করা হয়। চৌদ্দ শত বছর পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত, এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত হুবহু ও বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকবে। তার কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন ও রদবদল হয়নি। আর অতীতের কিতাবসমূহে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রদবদল হয়েছে। এমনকি বর্ণনার বিভিন্ন বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। অথচ যদি কেউ এই কুরআন পাঠ করতে ভুল করে তাহলে সাথে সাথে অন্য মুসলিমগণ তা শুধরিয়ে দেয় এবং তার পাঠ সংশোধন করে দেয়। এমন কি যদি তা নামাজরত অবস্থায়ও হয়ে থাকে।

কুরাআনী চ্যালেঞ্জ :

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذلك الكتب لا ريب فيه (سورة البقرة ٢)

এই কিতাবের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই (সূরা বাকারা ২ঃ২)

تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (سورة غافر٢)

মহা পরাক্রম শালী মহা জ্ঞানী আলাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ গ্রন্থ। (সূরা গাফের ৪০ ঃ২)

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (سورة النساء ٨٢)

তারা কি আল কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? এটা যদি আলাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। (সূরা নিছা ৪ঃ৮২)

রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন,

كتاب الله , فيه نبأ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم , هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار , قصمه الله ، ومن ابتغي الهدي في غيره , أضله الله ، وهو حبل الله المتين ،

وهو الذكر الحكيم , والصراط المستقيم , وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع من العلماء ولا يخلق علي كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ،، (أخرجه الترمزي)

আলাহর কিতাব যার মধ্যে তোমাদের পূর্ব পুরুষের সংবাদ রয়েছে, তোমাদের পরবর্তী সব কিছুর সংবাদ রয়েছে। তোমাদের মাঝে বিচারের নিয়মনীতি তাতে রয়েছে। এটি সুদৃঢ়, দুর্বল নয়। ক্ষমতার বলে যে

এটাকে ছেড়ে দেয়, আলাহ তাকে ধ্বংস করেন । কুরআন ছাড়া অন্য কোন পথে যে হেদায়েত অনুসন্ধান করে, আলাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। কুরআন হলো আলাহর শক্ত রশি। এই কুরআন বিজ্ঞানময় এবং সরল সঠিক পথ, এর মাধ্যমে হৃদয়ের বক্রতা আসবে না, ভাষার মিশ্রণ হবে না। এর থেকে আলেম ও বিজ্ঞানীগণ পরিতৃপ্ত হবে না বরং চাহিদা বাড়তে থাকবে। দ্বন্দ্বের উদ্ভব হবে না এবং এর অলৌকিকতা শেষ হবে না। (তিরমিজি শরীফ)

এই সেই কুরআন যা শ্রেষ্ঠ নবীর চিরন্তন মু'জিযা হিসাবে নাজিল হয়েছে। যার বর্ণনার রয়েছে বিশেষ নৈপুণ্য, অল্প শব্দে বিশদ বর্ণনা, অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গি, ভাবের গাম্ভির্য, যুক্তির দৃঢ়তা, তথ্যের বিশুদ্ধতা, সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক গাঁথুনি। তাতে আরও রয়েছে মানব জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিপূর্ণ ও নির্ভুল আলোচনা।

আলাহ তা'আলা বলেন,

وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين

(سورة يونس ٣٧)

এই কুরআন আলাহ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়, পক্ষান্তরে এটি পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থন ও বিধান সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। সন্দেহ নেই ইহা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (সূরা ইউনুস ১০ঃ ৩৭)

এই কুরআন সর্ব যুগের মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এই চ্যালেঞ্জ শুধু আরবী সাহিত্য ও ভাষাগত নয় বরং মানব জীবন পরিচালনা সহ সব দিক দিয়ে। কুরআনী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য কাফের মুশরেকরা সার্বিক চেষ্টা চালিয়েছে। পরিশেষে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এটা কোন মানুষের রচিত বাণী হতে পারে না।

আল-কুরআনের এ সব তথ্য যা আসমান, জমিন, সাগর, জন্তু, তরুলতা ও মানুষ সম্পর্কে প্রদান করা হয়েছে, তা আজ আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, হিন্দ ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ বের করছেন। তারাও এর সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, কুরআন মহান আলাহ বাণী এবং তার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। আলাহ তা'আলা বলেন,

قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض (سورة الفرقان ٦)

বলুন একে তিনি অবতীর্ণ করেছেন যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। (সূরা ফুরকান ৬)

এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আলাহ তা'আলা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা একে আলাহর কালাম বলে স্বীকার না করে কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরা এর অনুরূপ কালাম বেশী না হলেও একটি সুরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেয়া মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পশ্চাদপথ অবলম্বন করেছে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কেউ সামনে অগ্রসর হয়নি, কেউ সাহস করেনি কুরআনের অনুরূপ অন্য একটি আয়াত রচনা করার। অথচ তারা রসুলুলাহ সা. এর বিরোধিতায় নিজদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করতে কুণ্ঠা বোধ করত না। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ একটি সুরা লিখে আনার মত কাজটিতে তারা সফল হল না। এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ আলাহ তাআলার কালাম, ভাষা সাহিত্য ছাড়াও এর অর্থ সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান ও উপাদান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভব।

শেখ জিন্দানি বলেন, যতবার প্রফেসর আর্মষ্ট্রং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমরা ততবার তার প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছি, যার সাথে তিনি একমত ছিলেন। অতঃপর আমরা তাকে বললাম, আপনি নিজে আধুনিক জ্যোতি-শাস্ত্রের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন রকেট, মহাশূন্য যান ইত্যাদির আবিষ্কারও প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনি এটাও দেখেছেন যে, একই ঘটনা কুরআনে বিবৃত হয়ে আছে ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব থেকেই। সুতরাং কুরআন ও বিজ্ঞানের ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? উত্তরে তিনি বলেন, এ আলোচনার সূচনা থেকেই আমি আপনাদের পক্ষ থেকে প্রশ্নটি নিয়ে ভাবছিলাম এবং এটা আমাকে প্রভাবিত করেছে যে, আল-কুরআনের তথ্যের সাথে আধুনিক জ্যোতিশাস্ত্রের অসাধারণভাবে সামঞ্জস্য রয়েছে। কি অবাক লাগে উভয়ের মধ্যে কোন গরমিল নেই, নেই কোন সংঘর্ষ। কত চমৎকার মিল এ প্রাচীন গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মাঝে।

এই বলে প্রফেসর আর্মষ্ট্রং অকপটে বলে উঠলেন ১৪০০ শত বৎসর পূর্বের প্রাচীন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ উদ্ধার করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে আমি যা দেখেছি তাহলো, আল-কুরআনের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকুক বা না থাকুক, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু পর্যবেক্ষণের সৌভাগ্য নসিব হয়েছে, তা দিয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে ইহা মানবীয় জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বের গ্রন্থ। এ পর্যায়ে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনারা আমার কাছ থেকে উত্তরটি যেভাবে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে জবাবটি না দিতে পারলেও আমি অনেক কিছু বলে ফেলেছি। যেহেতু একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আমার কাজ হলো কোন প্রশ্নের জবাবের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকা। আমি মনে করছি, এখানেই থেমে যাওয়া ভাল। তবে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি গভীর ভাবনার বিষয়, যখন বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার ছিল না, তখন কীভাবে নিরক্ষর মুহাম্মদ সা. এ অলৌকিক জ্ঞান প্রচার করলেন? কোত্থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করলেন? সমগ্র বিজ্ঞান আজ যে জ্ঞানের কাছে অবনত মস্তক। নিশ্চিত এটা কোন মানবীয় জ্ঞান নয়; বরং ওহির জ্ঞান এবং এক মহাশক্তি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। আর সে শক্তি হলেন তামাম জাহানের মালিক আলাহ তাআলা। এই বলে তিনি বিশ্বাস করলেন, আলাহ তা'আলাকে এবং তার বন্ধু মুহাম্মদ সা.-কে, আর বিশ্বাস করলেন বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে মহা গ্রন্থ আল-কুরআনকে।

অতঃপর তিনি মন্তব্য করেন, যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের জন্য জ্ঞান আহরণের এক মহা উৎস হলো আল-কুরআন। তাতে রয়েছে বহু অজানা ভাণ্ডার। আলাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم (سورة الحشر ٢٢)

'সেই আলাহ অভিজ্ঞ দৃশ্য ও অদৃশ্যের সকল বিষয়ের, আর তিনি দয়াশীল ও করুণাময়। (সূরা হাশর-২২)

তিনি আরো মন্তব্য করেন, একমাত্র আলাহ পাকই জানেন, আসমান ও জমিনের সকল প্রকৃত গোপন তথ্য।

শেখ জিন্দানী বলেন, আমরা বিজ্ঞানীদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এমন একটি যুগের সন্ধান লাভ করেছি, যেখানে ধর্ম ও বিজ্ঞান আলিঙ্গন করতে পারে এবং উভয়ই সত্যের পরাকাষ্ঠা হতে পারে। সুতরাং আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে কোন অসংগতি নেই এবং থাকতেও পারে না। বুদ্ধিজীবীরা শতাব্দী ব্যাপী গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, স্বর্গীয় জ্ঞান ও মানবীয় বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি তারা বলে আমরা মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছি, সেটাও আল-কুরআনে বহু পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে। যেমন আলাহ তাআলা বলেন,

سبحن الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي (سورة الإسراء ١)

অর্থাৎ পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। (বনী ইসরাঈল ঃ১)

আধুনিক বিজ্ঞান আজ মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। কী ভূতত্ত্ব বিদ্যা, কী ইতিহাস, কী মহাকাশ আবিষ্কার সব ক্ষেত্রেই রয়েছে কুরআনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল। চন্দ্র বিজয়ী বিজ্ঞানী নীল আর্মষ্ট্রংসহ অসংখ্য বিজ্ঞানীর কণ্ঠ থেকে তাই আজ ধ্বনিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সত্য জ্ঞান-ই আলাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় :

আলাহ তাআলা জ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা মানব জাতির কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। শুধু জ্ঞানই নয়, জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত সকল শাখার দিশারি হচ্ছে কুরআন।

বস্তুজগতের জ্ঞানই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বিষয়ক বহু আলোচনা হয়েছে আল কুরআনে। ইসলামী পরিভাষায় ইলম ও হিকমত এ দুটি শব্দই জ্ঞানের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গভীরভাবে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতি ও সামাজিক জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলোর উলেখ করতে গিয়ে 'হিকমত' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'ইলম' শব্দটি প্রয়োগ খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় প্রকৃতি রাজ্যের এমন নৈসর্গিক ঘটনাবলীর দিক আলাহ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, যেগুলোতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা জড়িত রয়েছে। সে সকল বর্ণনায় ইলম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বুঝাবার জন্যই আলাহ ইলম শব্দের প্রয়োগ পছন্দ করেছেন।

আলাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তাঁকে এমন গুণে ভূষিত করলেন যা দ্বারা তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব হলো। আল-কুরআন তার অনুসারীদেরকে জ্ঞান শিক্ষা করার ক্ষেত্রে আলাহর অনুগ্রহ লাভ করার দুয়া শিখিয়ে দিয়েছে,

وقل رب زدني علما (سورة طه١١٤)

বল হে আমার প্রতিপালক। আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর (সূরা ত্ব'হা ২০ ঃ ১১৪)

আলাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا (سورة البقرة ٢٣٩)

তিনি যাকে ইচ্ছা বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করেন। আর যে ব্যক্তিকে বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রদান করা হলো তাকে মহা সম্পদ দান করা হলো। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৬৯)

আল-কুরআন আমাদেরকে যেমন জ্ঞান অর্জন করার আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছে, তেমনি অনুপ্রেরণা দিয়েছে জগৎ সমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার প্রতি। কারণ প্রতিটা সৃষ্টির মাঝে আলাহর অলৌকিক কুদরত ও নিদর্শন রয়েছে। তাইতো বর্তমান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর যুগে সঠিক বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শত শত বিজ্ঞানীগণ সেই মহান স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনতে শুরু করেছে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীগণ আলাহর বিভিন্ন সৃষ্টির মাঝে সুদৃঢ়, সুক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছেন। পৃথিবীর আবর্তন ও তার পৃষ্ঠে সংঘটিত ঘটনাবলী, চন্দ্র-সূর্য ও তারকাসহ জগতের সর্বত্র শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরই সুষম বিন্যাস। তাই আলাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

انظروا ماذا في السموات والأرض (سورة يونس ١٠١)

তোমরা দেখ আসমান ও জমিনে কি রয়েছে? (সুরা ইউনুস ১০ ঃ১০১)

أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء (سورة الأعراف ١٨٥)

আসমান ও পৃথিবীর রাজ্যে যা কিছু আলাহ সৃষ্টি করেছেন তা কি তারা দেখে না? (সূরা আরাফ ৭ঃ১৮৫)

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে মহা বিশ্বের এ বিশালতা ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া হয়, তবে আমাদের দৃষ্টি সীমানাকেই শুধু ক্লান্ত করবে না বরং আমাদের কল্পনাকেও অভিভূত করে দেবে। যার ইঙ্গিত আল কুরআন বহু আগেই ঘোষণা করেছেন,

ما تري في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير . (سورة الملك)

দয়াময় আলাহর সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না, আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? এরপর বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মুলক ৬৭ ঃ ৪)

তাই বলতে পারি আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক গভীর। তবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব লব্ধ জ্ঞান হতে হবে কুরআনি নির্দেশনা মোতাবেক। যেহেতু কুরআন হচ্ছে আলাহ প্রদত্ত ঐশী বাণী, যাতে নেই সন্দেহ, নেই কোন মিথ্যার অবকাশ। শত ভাগ সত্য ও সঠিক এবং কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত। আর বিজ্ঞান হলো মানুষের আহরিত জ্ঞান, তাই তা স্থান কাল পাত্রের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়, সন্দেহ মুক্ত নয় ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে থাকে বহুলাংশে, কারণ মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

এ বিষয়ে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী মরিচ বোকাইলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন 'আমরা দেখেছি, মহা বিশ্ব সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াতও এমন নয়, যা বৈজ্ঞানিক বিচারে সঠিক নয়। যেখানে বাইবেলে ভুলের পরিমাণ পর্বত সমান, সেখানে কুরআনের কোন আয়াতে আমি কোন ভুল খুঁজে পাইনি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত আয়াতের সংখ্যা প্রচুর। আর এ সব বাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কীভাবে যে এতো বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে সে বিষয়টাই আমাকে বিস্মিত করেছে সবচাইতে বেশি।'

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মুসলিমদের অবস্থান :

নতুন আবিষ্কারক অমুসলিম বিজ্ঞানী ও আমাদের উদাহরণ ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় যারা কোন কারখানায় প্রবেশ করেছে। তাদের একজন এমতাবস্থায় কারখানায় প্রবেশ করেছে যে, তার কাছে রয়েছে উক্ত কারখানার মালিকের নির্দেশাবলী যাকে ক্যাটালগ বলা হয়। উক্ত কারখানায় প্রবেশকারী অপর ব্যক্তি তার কাছে কারখানা মালিকের নির্দেশাবলী নেই। সে সে কারখানায় ঘুরছে, চিন্তা ভাবনা করছে। সে একটি বোতাম দেখতে পেলো। তারপর সেই বোতামটি টিপে দেখল যে এই বোতামের কি কাজ রয়েছে। তারপর দেখল এই চাকা কি করে। তার কাছে এমনভাবে প্রকাশ পেলো যে এই বোতাম দিয়ে আলো জলে। ঐ বোতাম দিয়ে দরজা খোলে। এই যন্ত্রের এই কাজ, ঐ যন্ত্র দিয়ে এই জিনিস তৈয়ার হয়, তার বৈশিষ্ট্য এমন স্বাদ এমন, এমন ভাবে সে এই কারখানার বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করতে শুরু করল। যখনই সে বলে আমি আবিষ্কার করেছি যে এই বোতামের এই উপকার। তখনই যার কাছে ক্যাটালগ রয়েছে সে তা বের করে বলে এটা তো-ক্যাটালগে আছে।

এই বিশ্বজগৎ আলাহর সৃষ্টি এক অভূতপূর্ব অলৌকিক কারখানা। আর পবিত্র কুরআন হচ্ছে সেই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনাবলী বা ক্যাটালগ যাতে বিশ্বজগতের সকল তথ্য, সর্বকালের প্রয়োজন ও নির্ভুল বিধানসহ মানুষের কল্পনায় উদ্ভব হতে পারে এমন সব কিছুই এ গ্রন্থে রয়েছে। আলাহ তাআলা বলেন,

ما فرطنا في الكتاب من شئ (سورة الأنعام ٣٨)

এই কিতাবে আমি কোন কিছু লিখতে বাদ দেই নি (সুরা আনআম ৬ঃ৩৮)

অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মুসলিমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন জ্যোতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ভূগোল শাস্ত্রে কুরআন মাজীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যা আধুনিক বিশ্বকে হতবাক করে দেয়।

তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মুসলিমদের কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার কুরআনের মত মহা গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও কেন তারা বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে? আর কাফের মুশরিক ও নাস্তিকরা কেন, কি ভাবে বিস্ময়কর নতুন আবিষ্কারের অগ্রগতিতে উন্নতি সাধন করেছে?

আলাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন,

سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق (سورة فصلت ٥٣)

অনতিবিলম্বে আমি আমার নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে দিব, বিশ্ব জগতে ও তাদের নফ্সের ভিতরে যাতে তাদের কাছে ফুটে উঠে যে, ইহা সত্য। (সূরা ফুস্সিলাত-৫৩)

যেহেতু তারা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করেনি, রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে, কুবআন মিথ্যা মনে করেছে। তাই মহাজ্ঞানী আলাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, শক্তি প্রদান করেছেন সুযোগ দিয়েছেন, সামর্থ্য জুগিয়েছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন, তাই তারা সক্ষম হয়েছে, আধুনিক আশ্চর্যজনক অলৌকিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এতো উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে। আর এটা এ জন্য যে যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় ইহা সত্য। তাইতো বর্তমান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগে সঠিক বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, বৈচিত্রময় মহা বিশ্বের এ বিশালতা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার একজন পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক রয়েছে।

১১ই আগস্ট **১৯৯৯** ইং একটি সূর্য গ্রহণ হবে, যা কর্ণওয়ালে পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হবে-এটা শুধু একটি অনুমান ভবিষ্যৎ বাণী নয়, বরং মহাশূন্যবিদরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, সৌরজগতের বর্তমান পরিভ্রমণ বিধি অনুযায়ী গ্রহণ সংঘটিত হওয়া আবশ্যক। যখন আমরা আকাশের দিকে তাকাই তখন অসংখ্য তারকাকে একটি ব্যবস্থার অধীন বিন্যাস দেখে অবাক হয়ে যাই। বহু যুগ পূর্ব হতে সীমাহীন মহাশূন্যে যে সমস্ত বিরাট বিরাট গোলক ঝুলে রয়েছে, সেগুলো একটি নির্দিষ্ট রাস্তায় পরিভ্রমণ করে চলেছে। তারা এত বাঁধা ধরা নিয়মে আপন কক্ষের উপর আবর্তিত হচ্ছে যে, তা কখন কোন দিকে যাবে, কোথায় অবস্থান করবে তা বহু শতাব্দী পূর্বেও সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। পানির একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফোটা থেকে আরম্ভ করে সীমাহীন মহাশূন্যের দূরদূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত সর্বত্রই একটি অতুলনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান। এদের কাজ কর্মের মধ্যে এই পরিমাণ পূর্বাপর সামঞ্জস্য রয়েছে যে, আমরা এর ভিত্তিতে অনায়াসে তাদের বাঁধা ধরা একটি বিধি প্রদান করতে পারি।

আমি একজন আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানী জর্জ আর্ল ডেউস এর উক্তি তুলে ধরতে চাই।

তিনি বলেছেন ঃ

‘যদি সৃষ্টি জগৎ নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার গুণাবলি রয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা মানতে বাধ্য যে, স্বয়ং সৃষ্টিজগৎই আলাহ, এভাবে যদিও আমরা আলাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করছি কিন্তু এই আলাহ এমন বিরল ধরনের যে, তিনি একই সময়ে যেমন সৃষ্টিকর্তা তেমন জড় উপাদানও। আমি এ ধরনের একটি অলীক ধারণা পোষণ করার চাইতে এমন এক আলাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকে শ্রেয় মনে করি, যিনি এ জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি স্বয়ং এ জগতের কোন অংশ নন, বরং এর শাসক, ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক।

আমরা একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে এক নাস্তিকের বিতর্কসভা বর্ণনা করছি। এক বিরাট জনসমাবেশে উক্ত নাস্তিকের সাথে তার বিতর্কের প্রোগ্রাম ঠিক হলো। সময় মত সে নাস্তিক সমাবেশে উপস্থিত হলো। কিন্তু উক্ত ইসলামী চিন্তাবিদ অনেক দেরিতে উপস্থিত হলেন। নাস্তিক ভদ্রলোক বলল, এত দেরি করে কেন আসলেন? আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার আসার পথে ছিল একটি নদী। পারাপারের উপায় ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ কি দেখলাম! আমার সম্মুখেই একটা বৃক্ষ গজাচ্ছে। এ বৃক্ষটা অল্প সময়েই বড় হয়ে গেল। অতঃপর আসল একটা কুড়াল। এই কুড়াল গাছটিকে কেটে ফেলল। তার পরে দেখলাম আসল করাত। করাত গাছটিকে চিঁড়ে তক্তা বানিয়ে ফেলল। অতঃপর পেরেক হাতুড়ি ইত্যাদি এসে গেল। আর তৈরী হয়ে গেল নৌকা। সে নৌকাটি আমার সম্মুখে চলে

আসল এবং সে নৌকা দিয়েই আমি পার হয়ে আসলাম। এতে একটু দেরি হয়ে গেল। নাস্তিক চিৎকার করে বলে উঠল, সাহেব, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন। এতগুলো কাজ কীভাবে নিজে নিজে হয়ে গেল? চিন্তাবিদ বললেন, এটাই হচ্ছে আপনার বিতর্ক সভার উত্তর। আপনি কীভাবে চিন্তা করতে পারলেন যে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতে গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ-পৃথিবী, আলো বাতাস, গাছ-পালা, মানুষ-পশু-পাখি, অসংখ্য জীব-জন্তু এসব কিছু নিজে নিজে তৈরী হয়ে গেল? উত্তর শুনে নাস্তিক হতবাক হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল এর পিছনে একজন শক্তিশালী সুনিপুণ কারিগর অবশ্যই আছেন। আর তিনিই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আলাহ এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও তার একমাত্র মালিক।

হয়তো কোন মানুষের হৃদয়ে এমন প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে যে, তাহলে কেন সকল বিজ্ঞানীগণ আলাহর প্রতি বিশ্বাসী হচ্ছে না? সত্যিকার অর্থে, যদি তারা এই মহা বিশ্বে আলাহর নিদর্শন দেখে থাকে?

তাদের সম্পর্কে আলাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين (سورة الأنعام ٤٤-٤٥)

অতঃপর তাদেরকে উপদেশ দেয়ার পর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, এমন কি যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত, আনন্দিত ও উলসিত হয় তখন আমি আকস্মিক তাদেরকে পাকড়াও করি। আর তখন তারা নিরাশ হয়ে যায়। অতপর জালিমদের মূল শিকড় কেটে ফেলা হয়। সমস্ত প্রশংসা আলাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (সূরা আনআম ৪৪-৪৫)

বর্তমান আবিষ্কার ও সালফেসালেহীন :

প্রশ্ন হতে পারে যে, বর্তমান মুসলিম আলেমগণ বলছেন, আমরা কুরআন ও হাদীসের সাথে সংশিষ্ট ও বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ততা নিত্য নুতনভাবে আবিষ্কার করেছি। অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছি, নতুন জ্ঞান অর্জন করেছি, নতুন জিনিস জানতে পেরেছি, যা আমাদের পূর্বপুরুষ জানত না, এই কথাগুলো কি সালফে সালেহীনগণের পরোক্ষ অপবাদ নয়?

না! তাদের প্রতি এগুলো মোটেই অপবাদ নয় কারণ ইলম বা জ্ঞান মানুষ অর্জন করে দুই পদ্ধতিতে (এক) শ্রবণের মাধ্যমে (দুই) প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে। যেমন ঢাকা শহরের বর্ণনা যদি কেউ অন্য কোন দেশে অথবা কোন গ্রামে বসে শ্রবণ করে যে, ঢাকা শহরে বহু তলা বিল্ডিং রয়েছে, রাস্তার দুই পাশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর গাছ রয়েছে রাস্তা গুলো প্রশস্ত। এ পাশ দিয়ে গাড়ি, বাস, ট্রাক এক দিকেই যায় আর অন্য পাশ দিয়ে আশে। সেখানে আরও রয়েছে চিড়িয়াখানা, বিমানবন্দর, সেগুলো এমন এমন ইত্যাদি। কিন্তু যদি সে ঢাকা শহরের আগমন করে তবে প্রকৃত পক্ষে বাস্তবে দর্শনে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যা সে শ্রবণের মাধ্যমে কল্পনা করতে পারেনি। প্রত্যেক দর্শনের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে, সেই হচ্ছে অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা যা বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বর্ণনা করেছেন। তাই আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে বর্তমান আবিষ্কৃত জ্ঞান বিজ্ঞান ১৪০০ বছর পূর্বে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহা সত্য এই বাণীর ব্যাখ্যা মাত্র।

আলাহ তাআলা বলেন,

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله (سورة يونس ٣٩)

বরং যা তারা বুঝতে অক্ষম তা তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে অথচ এখনও তাদের কাছে এর বিশেষণ আসেনি। (সূরা ইউনুস ১০:৩৯)

সৃষ্টি জগতের বাস্তব দর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁদের ঠিক ছিল না। কিন্তু শ্রবণের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়। যার বাস্তব প্রমাণ হিসেবে আমরা এখানে মিরাজের ঘটনা উলেখ করতে পারি। যখন রাসূল সা. মিরাজের ঘটনা সকাল বেলা বর্ণনা করলেন, তৎক্ষণাৎ মুশরিকরা সুযোগ পেয়ে আবু বকর রা. এর কাছে এসে বলল, শুনেছ তোমার মোহাম্মদ কি বলছে? তুমি তো চোখ বুঝে মোহাম্মদেরই কথাবার্তা মেনে নাও, সত্য মিথ্যা যাচাই কর না। আবুবকর রা. বললেন, তিনি কি বলেছেন? তারা বলল, আজ সে বলে যে, গতরাতে সে না কি এক মাসের পথ ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে। আবু বকর রা. বললেন, 'যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে তিনি সত্য বলেছেন।' এমনি সুদৃঢ় ছিল তাঁদের ঈমান ও বিশ্বাস।

পৃথিবী ঘুরছে ও আল-কুরআন ঃ

পৃথিবী ঘুরছে কথাটি এখন আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বদ্ধ মূলে রূপান্তরিত হয়েছে। উপগ্রহের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তা অবলোকন করছে, যাতে আলোচনা বা দ্বন্দ্বের অবকাশ রাখে না। রকেটের মাধ্যমে সৌরজগৎ পরিভ্রমণ কারীগণ যেভাবে দেখেছেন, ফট উঠিয়েছেন, তা কোন জ্ঞানীর পক্ষে অস্বীকার করার মত নয়।
'পৃথিবী ঘুরছে এর প্রমাণ হিসেবে আমরা এখানে চন্দ্র গ্রহণ সূর্য গ্রহণ, দিবারাত্র, ঋতুর আগমনকে পেষ করার প্রয়োজন মনে করছি না, কারণ এগুলো বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদী যা মূর্খ ও অহংকারী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু এ বিষয়ে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে কুরআন যা বর্ণনা করেছে তা আমরা এখানে উপস্থাপন করতে চাই, যা সত্যিকার অর্থে মানব জাতিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে এবং কুরআনের সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রথম দলিল :
আলাহ তা'আলা বলেন,

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في ملك يسبحون (سورة الأنبياء ٣٣)

তিনি রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটাই কক্ষ পথে বিচরণ করছে। (সূরা আম্বিয়া-৩৩)
এই আয়াততে পৃথিবী ঘুরছে এমন সুক্ষ্য ইঙ্গিত বহন করছে। এখানে রাত ও দিনের সময়কে উলেখ করে পৃথিবীকে বুঝান হয়েছে। কেননা রাত ও দিন পৃথিবীতেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। যদি পৃথিবী না থাকতো তবে আলো ও অন্ধকার প্রকাশ পেত না, কোন রাত ও দিনের আবির্ভাব ঘটতো না। এই আয়াতে রাত দিন উলেখ করে যেন আলাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য প্রত্যেকটি এই বিশাল সৌরজগতের কক্ষপথে ঘুরছে।
আরবী ভাষার সৃষ্টি শব্দটি মর্মস্পর্শকৃত কোন জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে যাকে। তবে এই আয়াতে দিন ও রাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তিনি রাত ও দিন অর্থাৎ অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। অন্ধকার ও আলো কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। তাই আলাহ রাব্বুল আলামীন অন্য আয়াতে এরশাদ করেন।

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور (سورة الأنعام)

সকল প্রশংসা সেই আলাহর জন্য যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। (সূরা আনআম ৬ঃ১)
এখানে আসমান ও জমিনের ব্যাপারে খালাকা শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং আলো ও অন্ধকারের ব্যাপারে যায়ালা শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেহেতু সেই আয়াতে রাত ও দিনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সেহেতু বলা যায় যে, এখানে স্থান অর্থাৎ পৃথিবীকে বুঝান হয়েছে। এমন বহু উদাহরণ কুরআন ও আরবী ভাষায় রয়েছে। যেমন আলাহ তা'আলা বলেন,

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهم فيها خالدون (سورة آل عمران ١٠٧)

আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে আলাহর রহমতের মধ্যে, তাতে তারা অনন্ত কাল অবস্থান করবে। (সুরা আল ইমরান ৪ ঃ ১০৭)
এখানে আলাহর রহমত বলতে জান্নাতকে বুঝান হয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে,

وينزل لكم من السماء رزقا (سورة غافر ١٣)

তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিজিক নাজিল করেন। অর্থাৎ তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যার কারণে রিজিক উৎপন্ন হয়ে থাকে। এমন কোন আলেম ও জ্ঞানী একথা বলেন না যে আসমান থেকে চাল ডাল, শাক-শব্জি ও ফল অবতীর্ণ হয়।

(দুই) উলেখিত আয়াতে বলা হচ্ছে, كل في فلك يسبحون প্রত্যেকটি সৌরজগতে ঘুরছে।
যদি শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্র ঘোরার কথা বলা হতো, তবে বহু বচন ব্যবহার না করে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করা হতো। তাই বলা যায় যে, রাত ও দিন থেকে পৃথিবীকে বুঝান হয়েছে অতএব পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র প্রতিটাই মহা শূন্যে নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে।
তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, কুরআন কেন পৃথিবী ঘুরছে এমনভাবে স্পষ্ট করে সরাসরি বর্ণনা করল না, যেমন করে সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাপারে বর্ণনা করেছে?
পবিত্র কুরআন স্বীয় বর্ণনায় হিকমত অবলম্বন করেছে। তাই কুরআন সব যুগের গ্রহণযোগ্যতার অধিকারী হয়েছে। যে যুগে এই কুরআন নাজিল হয়েছে, সেই যুগে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়নি। সেই সময়

যদি 'পৃথিবী সূক্ষ্ম ঘুরছে' এমন কথা সরাসরি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতো, তবে মানুষের ধারণ ক্ষমতার বাইরে তাদের জ্ঞানে তা গ্রহণ করতে পারতো না। যেহেতু তাদের কাছে এটাকে প্রমাণ করার মতো কোন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়নি বলে বিশ্বজগতের তত্ত্বসমূহ অপ্রকাশিত ছিল। তাই তাদের এ ব্যাপারে গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়ে যেতো, এটাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার সুযোগ পেতো এবং এটাকে অস্বীকার করতো। মানুষের জ্ঞানের পরিধি ও অবস্থা বুঝে বর্ণনা করা কি হিকমত নয়?
এ ব্যাপারে আর একটি সুন্দর উপমা রয়েছে, যেমন যানবাহনের ব্যবহারে ব্যাপারে যদি কুরআন সেই সময় বর্ণনা করতো যে, যানবাহনের মাধ্যম শুধু মাত্র ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর নয় এবং তোমরা অনতিবিলম্বে গাড়ি, বাস, রেলগাড়িতে আরোহণ করবে, যা ঘোড়া দিয়ে টানতে হবে না। শুধু তাই নয় বরং তোমরা আসমানে হেলিকপ্টার, বিমান ও রকেটের মাধ্যমে মহাশূন্যে উড়ে বেড়াবে। তবে অবশ্যই তারা তখন কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য দ্রুত ধাবিত হতো। আর এই কারণেই কুরআন তার অলৌকিক পদ্ধতিতে এমন ভাবে বর্ণনা করেছে যা মানুষের আঁকল ও বিবেক তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে আসুন দেখা যাক কুরআনের সেই বাণীর দিকে।
আলাহ তা'আলা বলেন:

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون (سورة النحل ٨)

তোমাদের আরোহণের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া খচ্চর ও গাধা এবং তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৮)
অর্থাৎ গাড়ি, রেলগাড়ি, বিমান, রকেট ও মহাশূন্য যান ইত্যাদি। আর এগুলো মহান করুণাময় আলাহ তা'আলা মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষ আজ এ ধরনের বিভিন্ন আশ্চর্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে ও হচ্ছে এবং আরও হবে ইনশা আলাহ।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي (سورة طه ٥٠)

তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্যতা অনুসারে আকৃতি দান করেছেন। অতপর পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা তাহা ২০ ঃ ৫০)
আর এই রহস্যের কারণেই সেই আয়াতে রাত দিন উলেখ করে পৃথিবীকেই বুঝান হয়েছে। আরও উলেখ করা যেতে পারে যে, অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে অতি বিশাল বিশাল গ্যালাক্সি এই কুলু শব্দটির আওতাভুক্ত। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছে মহাবিশ্বে অতি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রন ও প্রোটন। এই ইলেকট্রন ও প্রোটন পরমাণুর ভিতরে ঘুরতে থাকে। অতএব এই জগতে কোন কিছুই স্থির নেই এবং প্রত্যেকটিই ঘুরছে।

দ্বিতীয় দলিল :

আলাহ তা'আলা বলেন:

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ذلك يسبحون (سورة يس ٣٧-٤٠)

রাত্রি তাদের জন্য একটি নির্দেশন, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে চলতে থাকে। এটা পরাক্রম শালী, সর্বজ্ঞ আলাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনজিল নির্ধারিত করেছি, অবশেষে সে পুরাতন খেজুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য চন্দ্রের নাগাল পেতে পারে না। এবং রাত্রি দিনের অগ্রে চলে না। প্রত্যেকটি তার কক্ষ পথে বিচরণ করছে। (সূরা ইয়াসীন ৩৭-৪০)
আলোচ্য আয়াত গুলোতে আলাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত বর্ণনা শেষে বলছেন: "প্রত্যেকটি কক্ষ পথে বিচরণ করছে"। এই প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উলেখ করেছেন যা আলোচ্য আয়াত গুলোতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা উলেখ করেছেন। এর পর দিবা ও রাত্রি দৈনন্দিন পরিবর্তনের উলেখ করেছেন। এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও উপগ্রহ চন্দ্রের আলোচনার পরিশেষে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ
এখানে শব্দটি পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র সহ সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই বহু বচন ব্যবহার হয়েছে। এই কথাটা যদি সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তবে দ্বিবচন ব্যবহার হতো। অতএব বর্তমান আধুনিক যুগের

আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, পবিত্র কুরআন সর্বকালীন উপযোগী, সময় ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে নব নব তথ্য হাজির করে বিশ্ববাসীর কাছে।

তৃতীয় দলীলঃ

আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا , ولإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ، إنه كان حليما غفورا (سورة فاطر ٤١)

নিশ্চয়ই আলাহ আসমান ও জমিনকে ধরে রেখেছেন, যাতে স্থানচ্যুত না হয় । যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলো ধরে রাখবে। তিনি সহনশীল ও ক্ষমা পরায়ণ। (সুরা ফাতের ৩৫ঃ ৪১) আমাদেরকে আলাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার কুদরতের হাত দিয়ে আসমান ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন যাতে হেলে দুলে, ও স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে না যায়। যদি কোন কিছুর উপর থেমে থাকত তবে তা ধরা ও সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল না। যেমন করে আলাহ তার কুদরত দিয়ে আসমান কে ধরে রেখেছেন যাতে পৃথিবীর উপর পতিত না হয়। তেমনি ভাবে, তিনি পৃথিবীকে তার কুদরতের হাত দিয়ে ধরে রেখেছেন যাতে, হেলে দুলে না যায় এবং সূর্যের নিকটবর্তী না হয় অথবা সূর্য থেকে দুরে সরে না যায়। কারণ উভয়টাই মহাবিপদ জনক।

আধুনিক বিজ্ঞানে প্রকাশ পৃথিবী আপন মেরুর উপর প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করে ঘুরছে। অন্য কথায় বলতে গেলে তা আপন মেরুর উপর প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল বেগে চলছে। মনে করুন, যদি এর গতি প্রতি ঘণ্টায় দু'শ মাইল হয়ে যায় (এরূপ হওয়া একেবারেই অসম্ভব) তাহলে আমাদের দিন এবং আমদের রাত্র বর্তমানের অনুপাতে দশগুণ বেশী দীর্ঘ হয়ে যাবে। অত্যধিক রকমের উত্তপ্ত সূর্য প্রতি দিন যাবতীয় লতাগুল্ম জ্বালিয়ে দেবে। এতদসত্ত্বেও সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সেগুলোকে দীর্ঘ রাতের শীতলতা চিরদিনের জন্য খতম করে দেবে। সূর্য, যা এখন আমাদের জীবনের উৎস তার পৃষ্ঠদেশে বারো হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা রয়েছে এবং পৃথিবী থেকে এর দুরত্ব আনুমানিক ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। আর এই দুরত্ব বিস্ময়করভাবে অনবরত স্থিতিশীল। এই ঘটনা আমাদের জন্য সীমাহীন গুরুত্ব রাখে। কেননা যদি এই দূরত্ব হ্রাস পায় যেমন সূর্য অর্ধেক পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে যায়, তাহলে জমির উপর এত উষ্ণতার সৃষ্টি হবে যে, সেই গরমে কাগজ পুড়তে থাকবে, আর যদি বর্তমান দূরত্ব দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে এমন শীতলতার সৃষ্টি হবে যে, তাতে জীবনের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এই অবস্থা তখন সৃষ্টি হবে যখন বর্তমান সূর্যের জায়গায় অন্য কোন অসাধারণ নক্ষত্র এসে পড়বে-এমন বৃহৎ নক্ষত্র, যার উষ্ণতা আমাদের সূর্যের চাইতে দশ হাজার গুণ বেশী। যদি ঐ নক্ষত্র সূর্যের জায়গায় হত তাহলে তা পৃথিবীকে নির্ঘাত আগুনের চুলিতে পরিণত করত।
পৃথিবী ২৩ ডিগ্রি কোণাকারে শূন্যে ঝুঁকে আছে। এই ঝুঁকে থাকাটাই আমাদেরকে ঋতুর অধিকারী করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে জমির বেশীর ভাগ অংশ আবাদের যোগ্য হয়ে উঠেছে, বিভিন্ন ধরনের লতাগুল্ম এবং ফলমূল উৎপাদিত হচ্ছে। পৃথিবী যদি এভাবে ঝুঁকে না থাকত তাহলে দুই মেরুর উপর সর্বদা অন্ধকার ছেয়ে থাকতো। ফলে সমুদ্রের বাষ্পসমূহ উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ করত এবং জমি হয় তুষার আবৃত থাকত, নয় মরুভূমিতে পরিণত হত। এ ছাড়াও আরো অনেক চিহ্নাদি ফুটে উঠত যার ফলশ্রুতিতে ঝোঁকবিহীন পৃথিবীর উপর জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে উঠত। এটা কত অবিশ্বাস্য কথা যে, জড় বস্তু নিজেই নিজেকে এভাবে এত সুন্দর করে ও যথার্থ আকার সুবিন্যস্ত করে নিয়েছে।

চতুর্থ দলিল :

আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ,صنع الله الذي أتقن كل شئ إنه خبير بما تفعلون (سورة النمل /٨٨)

তুমি পাহাড়সমূকে অচল ও স্থিতিশীল অবস্থায় দেখছ অথচ সেগুলো মেঘের ন্যায় চলছে এটা আলাহর কারিগরি যিনি সব কিছুকে সুসংহত করেছেন। তোমরা যা কিছু করছ তিনি তা অবগত আছেন। (সুরা নামল ২৭ ঃ ৮৮)
এখানে মানব জাতিকে এই দুনিয়াতে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আলাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক দৃষ্টি ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য আহ্বান করছেন যে, কত সুন্দর সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ।

রকেটে মহাকাশ পাড়ি দিতে যাত্রীকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। নতুবা জীবনের ঝুঁকি থাকে। তার এ সতর্কতার মধ্যে রয়েছে অভিকর্ষ তাপ ও চাপ সম্পর্কিত ব্যবস্থা। অথচ এ রকেটের বেগ মাত্র ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল কিন্তু আলাহর সৃষ্টি যে পৃথিবী নামক রকেটে করে আমরা এক অনন্ত যাত্রার আরোহী তার বেগ ঘণ্টায় ৬৭০০০ মাইল। এত বিপুল বেগে চলছি অথচ কোন রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বালাই নেই। কি অভাবনীয় ব্যবস্থা পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে, আবার সূর্য অনুরূপ ব্যবস্থা বরাবর ঘুরতে ঘুরতে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আমার তা কিছুই জানি না। এর কোন খবরই আমাদের জানা নেই। তাই আলাহ জানিয়ে দিলেনঃ

صنع الله الذي أتقن كل شئ (سورة النمل /٨٨)

(ঐটা) আলাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য যিনি সবকিছু সুষম করেছেন। (সূরা নমল ২৭ঃ ৮৮)

আমাদের মাঝে অনেকের ধারণা আয়াতটিতে আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা হয়েছে পৃথিবীর অবস্থা নয়, যেহেতু আয়াতটির পূর্বের আয়াতে আখেরাতের বর্ণনা রয়েছে।

আব্দুল মাজীদ ঝিন্দানী স্বীয় কিতাবে উলেখ করেছেন যে, কিছু তাফসীর কারক গণের অভিমত যে, উক্ত আয়াতে পৃথিবীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এবং এতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে পৃথিবী ঘুরছে। তারা অস্বীকার করেছে যে, এ অবস্থা কিয়ামতের নয়। কেননা কিয়ামত দিবসে মানুষদেরকে এমন জমিনে উঠান হবে যাতে কোন পাহাড় থাকবে না।

নবী করীম (স.) এরশাদ করেন:

يحشر الناس يوم القيامة علي أرض بيضاء , عفراء ، كقرصة النقي ,ليس فيها علم لأحد .(رواه البخاري ١١/٣٢٣)

কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন জমিনে একত্রিত করা হবে সেটা সাদা লাল মিশ্রিত রঙ্গের হবে, পরিষ্কার সমতল ভূমির ন্যায়। তাতে থাকবে না কারো কোন চিহ্ন। (বুখারী শরীফ) ১১/৩২৩

যদি বলা হয় যে, পাহাড়ের দৃশ্যের অবস্থা কিয়ামতের নয় বরং কিয়ামতের পূর্বে শিঙায় ফুৎকার দেয়ার সময়ের দৃশ্য।

আসলে শিঙার ফুৎকারের মাধ্যমে যখন বিশ্বজগৎ ধ্বংস হবে, তখন মানুষ থাকবে হয়রান, পেরেশান, ভীত, সন্ত্রস্ত ও নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞান হারা হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে পাহাড়ের দিকে নজর দেয়ার কোন পরিবেশ থাকবে না।

আলাহ তা'আলা বলেন:

يأيها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شئ عظيم ,يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد (سورة الحج ١-٢)

হে লোক সকল! তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর, নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যে দিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আলাহর আজাব সুকঠিন (সূরা হজ ২২ ঃ ১-৬)

আর একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াতে আলাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন এখানে শব্দটি আরবী পরিভাষায় সৃষ্টি নৈপুণ্য সূক্ষ্মতা, সামঞ্জস্য পূর্ণ নিখুঁত তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। অতএব আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, উক্ত আয়াতটি পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা করছে।

আয়াতটির শেষ অংশ হচ্ছে অর্থাৎ নিশ্চয়ই তিনি অবগত আছেন (বর্তমানে পৃথিবীতে) তোমরা যা করছ। আখেরাত হচ্ছে, প্রতিদানের জন্য, যেখানে কোন কাজ নেই। অতএব আয়াতটি এটাই প্রমাণ করে যে এই অবস্থা দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক। আখেরাতের সাথে নয়। কোন কোন আলেমগণ ধারণা করছেন যে, পৃথিবী ঘুরছে না বরং স্থির রয়েছে। দলিল হিসেবে পেষ করছেন কুরআনের এমন আয়াত যাতে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلا لها أنهارا وجعل لها رواسي (سورة النمل ٦١)

কে পৃথিবীকে স্থিত (বাসপযোগী) করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন? (সূরা নমল ২৭ঃ৬১)

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বলেন ঃ তোমরা কীভাবে বলছ যে, পৃথিবী ঘুরছে অথচ আলাহ বলছেন পৃথিবী স্থির?

এই প্রশ্নটির জওয়াব সুন্দর করে দিয়েছে আব্দুল মাজিদ ঝান্দানী। তিনি বলেন প্রত্যেকটি নড়াচড়া অন্য কিছুর সাথে সম্পর্ক। যেমন আপনি কোন বিমানে আরোহণ করেছেন। আপনি এই বিমানে স্থির রয়েছেন,

কোন নড়াচড়া হচ্ছে না কিন্তু বিমানটি আপনাকে নিয়ে চলছে। আপনি বিমানের জন্য স্থির আর বিমানটি পৃথিবীর জন্য চলমান। একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছে। অতএব নড়াচড়া অবশ্যই অন্য কিছুর সাথে সম্পর্ক। এর উত্তর আমরা পবিত্র কুরআনেই পেয়ে থাকি।

আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا (سورة غافر ٦٤)

আলাহ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থির করেছেন। (সূরা গাফের ৬৪)

পৃথিবীর ঘুরছে এমন অবস্থায়ও তোমাদের জন্য স্থির করে বসবাসের উপযোগী করেছেন। এতেই মহান করুণাময় আলাহর কুদরতের সবচেয়ে বেশী বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

রাতদিনের পরিবর্তন ও আলকুরআন :

মহান প্রজ্ঞাময় সমস্ত জাহানের প্রতি পালক আলাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করে তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। মানব জাতির প্রতি আলাহর নিয়ামত অফুরন্ত ও অগণিত। দিনরাতের পরিবর্তন তন্মধ্যে অন্যতম । নির্ধারিত নিয়মে দিনরাত্রির পরিবর্তন হচ্ছে। আর একথা বর্তমান জমানায় সবার কাছে সুস্পষ্ট যে পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর ঘোরার কারণেই দিন ও রাতের সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বচক্ষে অবলোকন করছি যে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে একই নিয়মে রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত আসছে। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, এই পরিবর্তনে আমাদের কি কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসছে?

আলাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন:

إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون (سورة يونس ٦)

দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আলাহ আসমান ও জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে ভয়কারী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশন রয়েছে (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৬)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

وجعلنا الليل والنهار آيتين ،فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة (سورة الإسراء ١٢)

আমি রাত্রি ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতপর নিষপ্রভ অন্ধকার করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকময় করেছি। (সূরা ইসরা ১৭ ঃ ১২)

আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করেছে যে, এই দিন রাতের পরিবর্তন যদি না হতো তবে পৃথিবীর এক পৃষ্ঠের সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যেত এবং অন্য পৃষ্ঠে ঠান্ডায় মানব জাতি সহ সমস্ত জীবকুল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিত।

আলাহ তা'আলা বলেন:

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلي يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم لضياء أفلا تسمعون ، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلي يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون منه (سورة القصص ٧١-٧٢)

বলুন তোমরা ভেবে দেখেছ কি আলাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন। আলাহ ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে কি যে তোমাদেরকে আলোকময় দিন এনে দিবে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি আলাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আলাহ ব্যতীত এমন উপাস্য আছে কি যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (সূরা কাসাস ৭১-৭২)

আলাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। যথোপযুক্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করেছেন, খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করেছেন যা দিয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণ করতে পারে। পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী হেলে দুলে না যায়, সেখানে আর ব্যবস্থা করেছেন নদ নদী, গাছ পালা সহ প্রত্যেক জিনিসের সুসামঞ্জস্যতা।

আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا (سورة غافر ٦٤)

তিনিই মহান আলাহ যিনি পৃথিবীকে আবাস যোগ্য করেছেন (সূরা গাফের ৬৪)

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও আল কুরআন :

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে। তবে প্রত্যেকেই জানতে চায় কোন জিনিসে আকর্ষণ সৃষ্টি করে? এই আকর্ষণের কারণ কি? বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর হচ্ছে অত্যধিক ভারী এবং যার ওজন যত ভারী হবে তার আকর্ষণ তত শক্তি শালী হবে। তারা বলছেন আমরা যত মাটির নিচে নেমেছি ওজন তত বেড়েছে, তারা জমিনের অভ্যন্তরে ঠিক মাঝামাঝিতে এক প্রকার ভারী তরল পদার্থ পেয়েছেন যা সেখানে ঘুরছে। তার এই চলাচলটা একটা পথে পরিণত হয়েছে। আর এই হচ্ছে ম্যাগ্নেটিস যা প্রত্যেক বস্তুকে টেনে নেয় বা আকর্ষণ করে। তারা আরও বর্ণনা করেছে যে এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকার কারণেই মানুষ পৃথিবীর উপর চলাফেরা করতে পারছে, বৃষ্টির পানি নিচে মাটিতে আসে, গাছের ফল জমিনে পড়ে, বাতাস পৃথিবীর সাথে লেগে থাকে। শুধু তাই নয় পৃথিবী হতে কোন বস্তুর দুরত্ব যতই বাড়তে থাকে ততই তার ওজন কমতে থাকে। আর যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যবস্থা মহান স্রষ্টা না করতেন তবে পৃথিবীর সব কিছু মহাশূন্যে হারিয়ে যেত, তা আর পাওয়া যেত না।
আলাহ তাআলা বলেন ঃ

إذا زلزت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها (سورة الزلزلة ١-٢)

যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে। (সূরা যিলযাল ১-২)
এই আয়াত দুইটির ব্যাখ্যায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সেমিনারে মুসলিমদের সাথে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার অধিবাসী সাতিকলাজ। তিনি বলেন: পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভারী বোঝা রয়েছে। আর এই বোঝাগুলো অনতিবিলম্বে বেরিয়ে আসবে। যখন সেগুলো বের হয়ে আসবে তখন অবস্থা কি হবে?

আলাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলছেন:

وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت (سورة الإنشقاق ٣-٤)

যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবীর গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও তা শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। (সূরা ইনসিকাক ৩-৪)
পৃথিবীর গর্ভস্থিত সবকিছু যখন বের হয়ে যাবে তখন আর তার মাধ্যাকর্ষণ থাকবে না। এই মহা বিশ্বের সুন্দর আইন শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি আর থাকবে না। এ সব কিছুই হবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে। ডা. হেমায়েত স্বীয় কিতাবে আরও বর্ণনা করেছেন: পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান না থাকলে অথবা কম হলে জলীয় বাষ্প উপরের দিকে চলেই যেত। আবার উপরে ঠান্ডা বাতাস জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করতে না পারলে জলকণা তৈরি হত না। ফলে বৃষ্টিও হত না। তাহলে একদিন পৃথিবীর সব পানিই বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াত। আর ফিরে আসত না। ফলে পৃথিবীতে কোন পানিই খুঁজে পাওয়া যেত না। যার ফলে নিঃশেষ হয়ে যেত জীবনের অস্তিত্ব। তিনি আরও বলেন: পৃথিবী যদি চাঁদের মত ছোট অর্থাৎ বর্তমান আয়তনের চারভাগের একভাগ হত তবে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানে যা আছে তার ৬ ভাগের ১ ভাগ। তাহলে সূর্যের তাপে পানি বাষ্প হয়ে উপরের দিকে চলে গেলে আর ফিরে আসত না কোনদিন। মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়ার কারণে চলে যেত তো চলেই যেত। ফলে দ্রুত শেষ হয়ে যেত পৃথিবীর সমুদয় পানি। 'এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।' (সূরা মু'মিনূন ২৩ ঃ আয়াত ১৮)
চাঁদ সবসময় পৃথিবীর দিকে একদিক মুখ করে ঘুরে। চাঁদের মত পৃথিবীও যদি সূর্যের দিকে একদিকে হত তাহলে সেই দিক হতো তীব্র শীত, যার কারণে পানি বরফ হয়ে যেত আর অন্যদিকে প্রখর গরমের জন্য পানি বাষ্পীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকত।
অতি গরম ও অতি শীত কোন অবস্থায়ই পানি পাওয়া সম্ভব হত না।
পৃথিবী যদি সূর্যের সমান বড় হত তবে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হত বর্তমানের ১৫০ গুণ। যার কারণে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা ৪ মাইলের চেয়েও কমে যেত। তাহলে পানি আর বাষ্পীভবন হত না। সারা পৃথিবী ডুবে যেত পানিতে।
সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব যদি বর্তমানের দ্বিগুণ হত তাহলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপ কমে গিয়ে দাঁড়াত বর্তমানের ৪ ভাগের ১ ভাগে। তদুপরি কক্ষপথ বৃদ্ধির কারণেও শীতকালের পরিমাণ হত বর্তমানের চার গুণ। কাজেই সারা পৃথিবীর পানি বরফে পরিণত হয়ে যেত। এমনকি গ্রীষ্মকালেও মুক্ত পানি পাওয়া যেত না। তীব্র শীত ও মুক্ত পানির অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত অতি সহজেই।

পাহাড় স্থাপন ও আল-কুআন :

আলাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে সেগুলো মানব জাতির সামনে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীগণ ১৯৫৬ সালের দিকে জানতে পেরেছেন যে, প্রত্যেক পাহাড়ের নিচে উক্ত পাহাড়ের শিকড় রয়েছে যা মাটির কঠিন আঠালো স্তর পর্যন্ত ভেদ করে রয়েছে। আর এটা এ জন্য আলাহ তাআলা করেছেন যাতে মাটির নরম স্তরটির কঠিন স্তরের সাথে সংযোগ থাকতে পারে এবং পৃথিবী ঘোরার সময় কম্পন সৃষ্টি না হয়, এবং এদিকে ওদিকে হেলে দুলে না যায়। যেমন আলাহ তাআলা বলেন ঃ

والجبال أوتادا (سورة ال٧)

(আমি কি করিনি) পর্বত মালাকে পেরেক? (সূরা নাবা ৭)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

وجعلنا في الأرض رواسي أن تميدبهم (سورة الأنبياء ٣١)

আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পরে। (সূরা আম্বিয়া-৩১)
তিনি আরও বলেন:

والجبال أرساها (سورة النازعات ٣٢)

তিনি পর্বতের দ্বারা তাকে (পৃথিবীকে) স্থিরতা দান করেছেন। (সূরা নাজিয়াত-৩২)

বিজ্ঞান আমাদেরকে আরও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পৃথিবীতে এমন কোন পাহাড় নেই যার ভূ পৃষ্টের অভ্যন্তরে শিকড় নেই। বরং পাহাড়ের দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে প্রায় তার সাড়ে চারগুণ লম্বা মাটির অভ্যন্তরে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সেগুলো পেরেকের ন্যায়। তাঁবু ঠিক রাখার জন্য বালির মধ্যে যেভাবে পেরেক ব্যবহার হয় ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবীকে ঠিক ও স্থিরতা রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে পর্বতমালা।

প্রফেসর শিয়াবিতা জাপানি ঐ বিজ্ঞানী চলমান বিশ্বের ভূ-তত্ত্ববিদদের অন্যতম। তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। সকল ধর্মের প্রতিই বিভ্রান্তিমূলক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানময় কুরআনের সত্যতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

কয়েকজন মুসলিম মনীষী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বললেন, বিশ্বের কোন ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিতদের মুখ খোলা উচিত নয়। কেননা যখন আপনারা কথা বলেন, তখন মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ সংঘর্ষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য বিশেষত ধার্মিক পণ্ডিতেরাই দায়ী। এর প্রতি উত্তরে মুসলিম মনীষীগণ বললেন, তাহলে ন্যাটো রাষ্ট্র সংঘ এবং ওয়ারম চুক্তি বা যুদ্ধ প্রতিযোগিতা এত বিপুল পরিমাণে নিউক্লিয়ার ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাগার নির্মাণ করেছে, এটার জন্যেও কি ধার্মিক পণ্ডিতেরা দায়ী? প্রতি উত্তরে তিনি নীরব। তখন বলা হলো সকল ধর্মের ব্যাপারে আপনি কটূক্তি করেন, তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেহেতু আপনি কম জ্ঞানের অধিকারী, সেহেতু এ ব্যাপারে কোন কঠিন মন্তব্য না করাই উত্তম। বরং আপনার নিকট জোর আবেদন জানাচ্ছি, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আপনি একটু জানুন ও গবেষণা করুন। অতপর তার সামনে তার গবেষণা বিষয়ক একাধিক প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন: আচ্ছা জনাব বলুনতো, পাহাড়গুলো কি দৃঢ়ভাবে মাটির সাথে স্থাপিত? নাকি ভাসমান? মহা দেশীয় ও মহাসাগরীয় পাহাড়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, মহা দেশীয় পাহাড় মূলত গঠিত হয় গাদ দ্বারা। পক্ষান্তরে মহাসাগরীয় পাহাড় গঠিত হয় আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধীয় শিলা দ্বারা। আর মহা দেশীয় পাহাড় সংকোচন শক্তির দ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু মহাসাগরীয় পাহাড় গঠিত হয় প্রসারণ শক্তি দ্বারা। আবার মহা দেশীয় পাহাড় হালকা উপাদান দ্বারা গঠিত। তবে মহাসাগরীয় পাহাড়ের গঠন হালকা বলেই এই পাহাড়গুলো হালকা নয়। কিন্তু ইহা গরম। আর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উভয় পাহাড়ই ভার বহন করার কাজ করে চলছে। অতএব আলাহর কুরআনে বলা হয়েছে যে, আমি কি পাহাড়কে পেরেক স্বরূপ স্থাপন করিনি? সুতরাং উভয় পাহাড়ই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করার কাজ করে চলছে। এ বিষয়টিতে আপনার মতামত কি?

এতদশ্রবণে প্রফেসর শিয়াবিতা ভূমিতে অবস্থিত এবং সমুদ্র বক্ষে দণ্ডায়মান সকল পাহাড়ের বর্ণনা দিলেন। আর তিনি এও বললেন যে, সকল পাহাড়ই পেরেকের আকৃতি বিশিষ্ট। যেন ফুটো জিনিসকে আটকে রাখার কাজ করছে। এবং ভূপৃষ্ঠ ও সাগরের ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে। অথচ এ মর্মে আল-কুরআন সু-স্পষ্টভাবে কথা বলেছে অনেক পূর্বেই, আর তা হলো আমি কি পাহাড়কে পেরেক স্বরূপ স্থাপন করিনি? তিনি অবাক হলেন, আজ থেকে ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে যখন মানুষের ধারণা ছিল খুবই দুর্বল। এত যান্ত্রিক উপাদান যখন ছিল না। বই পুস্তক ছিল না। আধুনিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের লিখিত কোন

দলিলও ছিল না, আবিষ্কার ছিল না, কি করে তখন মুহাম্মদ (সা) নিরক্ষর মানুষ হয়ে এই তাত্ত্বিক তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা আজকে তিলে তিলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমগ্র বিজ্ঞান যাকে শাশ্বত বলে মেনে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই ইহা কোন মানবীয় জ্ঞান নয়। বরং কোন অসীম ও ঐশী শক্তির পক্ষ থেকে সমাগত হয়েছে। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত জ্ঞান চিরন্তন সত্য। এই বলেই তিনি আল-কুরআনের ব্যাপারে মন্তব্য করলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ আল-কুরআন চিরন্তন সত্য।

উদ্ভিদের সবুজ রং ও আল-কুরআন :

মহান করুণাময় আলাহর সৃষ্টিতে গবেষণার মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন তথ্য ও রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও মানুষ বসে নাই এবং জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন যে উদ্ভিদে কীভাবে ফল হয় । তারা বর্ণনা করেন যে, পানি বর্ষিত হয়ে উদ্ভিদকে গজিয়ে দেয়। আর উদ্ভিদ পানি শোষণ করে সবুজ রঙ্গের পদার্থ তৈরি করে। ইংরেজিতে ওকে ক্লোরোফিল বলা হয়। এটাই সেই উপাদান যার দ্বারা উদ্ভিদের বীজ ও ফল সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় ফল উৎপাদনের কারখানা সৃষ্টিকর্তার কুদরতের এই সবুজ কারখানা মাধ্যমের পানি, বাতাস, কার্বনডাই-অক্সাইড ও সূর্যের তাপ সুগারে পরিবর্তন হয়ে ফলে পরিণত হচ্ছে।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنابه نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا (سورة الأنعام ٩٩)

তিনি (আলাহ) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতপর আমি তা থেকে সবুজ শাখা বের করেছি, ফলত ঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি বীজ উৎপন্ন করে থাকি খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, জয়তুন, আনার পরস্পর স্বাদৃশ্যশীল এবং স্বাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এ গুলোতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আনআম-৯৯)।
হাঁ, বিশ্বাসীদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এ সব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয়, একই সূর্যের আলো পায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ সবের রং ও স্বাদ ভিন্ন, আকারেও পার্থক্য। এ যেন মহান সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক কুদরতের অটোমেটিক মেশিন। জ্ঞান বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কারের ১৪০০ বছর পূর্বে এ ধরনের তথ্য কি ভাবে আলাহ কুরআনে স্থান পেলো? এ প্রশ্নের একমাত্র সঠিক জওয়াব এটাই যে, এই কিতাব কোন মানব রচিত বিধান নয় বরং মহান সৃষ্টি কর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবী সৃষ্টি ও আল-কুরআন :

পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন বিগ বেঙ থিওরিতে। বিগ বেঙ হলো ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ হলো বিকট শব্দ। এই বিগ বেঙ থিওরির মূল কথা হলো, আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে সৌরজগতে এক দিন হঠাৎ নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষ হয় এতে একটি বিকট শব্দ হয়। এই বিকট শব্দের মাধ্যমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গ্রহ নক্ষত্রের টুকরো থেকেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি।
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় সকলেই বিশেষত বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা বিগ বেঙ থিওরিতে বিশ্বাস করেন। এই বিগ বেঙ থিওরীকে যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক মনে করা হয় কারণ এই থিওরির পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্ক এবং ঐতিহাসিক উদাহরণ। যদিও এই বিগ বেঙ থিওরি বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক থিওরিই চিরন্তন নয়। সৌরজগৎ সম্পর্কে বা সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বার বারই মতের পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া এ নিয়ে একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী কোপারনিকাসকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছে। আধুনিক যুগে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে বিগ বেঙ থিওরিটাই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে বেশী বৈজ্ঞানিক। যদিও এই থিওরি নিয়েও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আজও পর্যন্ত মতানৈক্য রয়েছে। সম্প্রতি জন কেইরন নামে একজন লেখক "কেন বিগ বেঙ থিওরি ভুল" শীর্ষক একটি নিবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে যাক, বিগত বেঙ থিওরি মতে আজ থেকে ১০-১২ বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতে একটি বিকট শব্দে এক মহা সংঘর্ষ (বা এক্সপোজন) হয়েছিল। সে মহা সংঘর্ষে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং সে টুকরো থেকেই আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বক্তব্য হলো, সূরা আম্বিয়ায় আলাহ পাক বলেছেন:

أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما (سورة الأنبياء ٣٠)

এই সমস্ত অবিশ্বাসীরা কি জানে না যে, এক সময় আকাশ এবং পাতাল তথা মহাবিশ্ব একত্রে জোড়া লেগে একত্রে ছিল আর আমি (আলাহ) এগুলোকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছি। (সূরা আম্বিয়া ২১:৩০)

সমুদ্রের বাঁধ ও কুরআন :

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন যে, দুই সমুদ্রের পানি পরস্পর সম্মিলিত হয় না। যেমন রোম সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর পানি একটি অপরটির সাথে মিশতে পারে না, কারণ সেখানে রয়েছে অন্তরায়। অথচ যে যুগে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর কোন যন্ত্র পাতি ছিল না। এমন যুগে কুরআন বলে দিচ্ছে:

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان (سورة الرحمن ١٩-٢٠)

তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরায়, যা তারা অতিক্রম করে না। (সূরা রাহমান ১৯-২০)

তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই সমুদ্র বলতে মিঠা ও লোনা সমুদ্র বুঝানো হয়েছে। আলাহ তাআলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নজির পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয় সেখানে বেশ দুর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে থাকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠাও লোনা পানি উপরে নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আলাহ তা'আলা বলেন:

وجعل بين البحرين حاجزا أ أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون (سورة النمل ٦١)

বল তো কে পৃথিবীকে বাসপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝ খানে অন্তরায় রেখেছেন? অতএব আলাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (সূরা নামল ৬১)
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا و حجرا محجورا (سورة الفرقان ٥٣)

তিনি সমান্তরাল দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন একটি মিষ্টি, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ, উভয়ের মাঝে রেখে দেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল (সূরা ফুরকান ৫৩)।

কোষ্টা একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। সে সমুদ্রের পানি নিয়ে গবেষণা করেছিল, কি কারণে দুই সমুদ্রের পানির পরস্পর সম্মিলন ঘটে না। এক সমুদ্রের পানি এক রঙ্গের এবং এক স্বাদের অপর সমুদ্রের পানি আরেক রঙ্গের এবং আরেক স্বাদের।

সে সমুদ্রে গিয়ে প্রত্যক্ষ করল তারপর সে পানি সম্পর্কে গবেষণায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিল এবং কোষ্ঠ থিওরি নামে একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করল। কিছুদিন পর তার সঙ্গে একজন মুসলমান বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎ হল, তাঁর সম্মুখে কোষ্টা যখন তার মতবাদ উপস্থাপন করল তখন তিনি বললেন-"আপনি তো এখন গবেষণা করেছেন। আমি আপনাকে শত শত বছর আগের গবেষণা দেখাতে পারব। যখন মুসলিম বিজ্ঞানী তাকে কুরআন দেখাল কোষ্টা স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হল।

ফ্রান্সের বিজ্ঞানী জাক ভি. কোষ্টা, যিনি সমুদ্রের ভিতর পানি রিসার্চ বিষয়ে প্রসিদ্ধ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রোম সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর রাসায়নিক দিক থেকে একটি অন্যটির চেয়ে ভিন্ন রকম। তিনি এ বাস্তব সত্যটি অনুধাবন করার জন্য জিব্রাল্টারের দুই সমুদ্রের মিলন কেন্দ্রের কাছাকাছি সমুদ্রের তলদেশে গবেষণা চালালেন, সেখান থেকে তথ্য পেলেন যে জিব্রাল্টারের উত্তর তীর [মারুকেশ] আর দক্ষিণ তীর [স্পেন] থেকে আশাতীতভাবে একটি মিষ্টি পানির ঝর্ণা উথলে উঠে। এ বড় ঝর্ণাটি উভয় সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ৪৫ সূক্ষ্ম কোনে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চিরুনির দাঁতের আকৃতি ধারণ করে বাঁধের ন্যায় কাজ করে। এ ক্রিয়াকলাপের ফলে রোম সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর একটি আরেকটির সঙ্গে মিশতে পারে না।

দু'টি সমুদ্রের মিলনস্থলে যে পৃথকীকরণ বা পর্দা রয়েছে তা খালি চোখে বুঝার উপায় নেই। কেননা বাহ্যত সব সাগর একই রূপের মনে হয়। শুধু তিনি নন, বরং সমগ্র মেরিন বিজ্ঞানীরাই এই বাঁধা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। তারা ১৯৪২ সনে শতাধিক মেরিন স্টেশন বসিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরীক্ষা করলেন। কোন জিনিস দুই সাগরের মিলন কেন্দ্রে বাঁধা সৃষ্টি করে আছে? তারা তথায় আলো পরীক্ষা করেন, বাতাস পরীক্ষা

করেন এবং মাটি পরীক্ষা করে এর মধ্যে কোন বাঁধা বা পর্দা সৃষ্টি করার কারণ খুঁজে পেলেন না। এখানে পানির একটি হালকা, একটি ঘন রং পরিলক্ষিত হয়। যা খালি চোখে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।
এমনকি বিজ্ঞানীরা আরো গভীর ভাবে বিষয়টিকে উপলব্ধির জন্য এবং আরো-পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র-এর দূরের থেকে অনুধাবনের পদ্ধতির মাধ্যমে বা এর মাধ্যমে ছবি ধারণ করেন।
যার বর্ণনা এরূপ যে, ভূমধ্য সাগরের পানি গাঢ় নীল এবং আটলান্টিক সাগরের পানি হালকা নীল, আর জিবরাল্টার সেল যা পাহাড়াকৃতির এবং তার রং হল খয়েরি।
ঘনত্ব-উষ্ণতা এবং লবণাক্ততার দিক থেকে ভূমধ্য সাগরের পানি আটলান্টিকের তুলনায় অনেক বেশী। আরো মজার ব্যাপার হলো, ভূমধ্য সাগরের পানি জিবরাল্টার সেল বা সাগর তলের উঁচু ভূমির ওপর দিয়ে আটলান্টিক সাগরের মধ্যে শতাধিক কিলোমিটার প্রবেশ করেছে এবং তা ১০০০ হাজার মিটার গভীরে পৌঁছার পরেও তার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের ও রঙ্গের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যদিও এতদূভয়ের মাঝে রয়েছে প্রচণ্ড ঢেউ, প্রবল খরস্রোত এবং উত্তাল তরঙ্গ তথাপিও পরস্পর মিশ্রিত হয় না এবং একে অন্যকে অতিক্রম করতে পারে না। যেহেতু উভয়ের মাঝে রয়েছে একটি পর্দা।

সাগরের অভ্যন্তরে ঢেউ অন্ধকার ও আল-কুরআন :

আজকের যুগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রকাশিত যে গভীর সাগরের তলদেশে অত্যধিক অন্ধকার রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে তরঙ্গ বা ঢেউ যেমন ঢেউ রয়েছে পানির উপরিভাগে। উপগ্রহের মাধ্যমে ছবিসহ এসব তথ্য আবিষ্কার করেছে। অথচ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার গুলোর কথা কি করে এত নিখুঁত সত্যতার সাথে পূর্বাহ্নেই বলে দিয়েছে। আসুন তাহলে শোনা যাক পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে কি বলছে ঃ

أو كظلمات في بحر لجي يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (سورة النور ٤٠)

অথবা সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায় যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আলাহ যাকে জ্যোতি দেন না তার কোন জ্যোতিই নেই (সূরা নূর ৪০)।
সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার বৃদ্ধির কথা উপরোক্ত আয়াতে উলেখ করে আলাহ কাফেরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।
সাগর যখন শান্ত এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন ক্রমান্বয়ে সমুদ্রের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্ধকারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অশান্ত সাগরেও অস্বাভাবিক (দুর্যোগপূর্ণ) আবহাওয়ায় অন্ধকার আরো বৃদ্ধি পায়।
সূর্যের ৭টি আলোর মধ্যে সব আলো সমুদ্রের স্মান গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।
প্রথম ধরনের অন্ধকার ঃ সাধারণত ঃ সমুদ্রের ১০ মিটার গভীরতায় লাল ৩০ মিটারে কমলা, ৫০ মিটারে হলুদ, ১০০ মিটারে সবুজ এবং ২০০ মিটারে নীল আলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর মাছ পর্যন্ত নিজের শরীরের আলোর সাহায্য ছাড়া দেখতে পায় না। কারণ গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পূর্ণ অন্ধকার। এ অন্ধকারই হলো প্রথম ধরনের অন্ধকার।
২য় ধরনের অন্ধকার ঃ সাগরের উপরিভাগ শান্ত হওয়ার পরিবর্তে বাতাস বা অন্য কারণে যদি ঢেউ এর উপরে ঢেউ হয় তা'হলে সূর্যের আলোর অধিকাংশই প্রতিফলিত হয়ে ঢেউ এর তেরছা বা হেলানো দিক দিয়ে অপসৃত হয়ে যায়, এবং আলোর পরিমাণ দারুণভাবে হ্রাস পায়। এই সময় সাগরের তলদেশের অন্ধকার অনেক বৃদ্ধি পায়। একে বলে দ্বিতীয় ধরনের অন্ধকার।
৩য় ধরনের অন্ধকার ঃ আমরা জানি যে, মেঘ হলো ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের সমষ্টি। (এর মধ্যে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি-কণা এবং তুষার-কণা! এই কণাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বৃষ্টি-ভরা মেঘকে বলা হয় জমাট-মেঘ যার আকার বিশাল মেঘের পর্বতের মত। এর খাড়া-উচ্চতা বেশ দীর্ঘ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর গভীরতার ব্যাপ্তি ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ হাজার ফুটের মধ্যে।) উপর থেকে সূর্যের আলো যখন একে ভেদ করে তখন আলো প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে সূর্য-কিরণের বড় অংশটা মেঘ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঢেউ এর উপর পড়ে কদাচিৎ পানির গভীরতা অতিক্রম করতে পারে। ফলে সাগরের তলদেশ সমগ্র আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে সাগরের তলদেশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বিরাজ করে। এ ধরনের অন্ধকারে কেউ তার নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পায় না;-এমনকি হাত চোখের সামনে তুলে ধরলেও। তা'হলে অন্ধকারের গভীরতা কতটা বিশাল!

এমন এক যুগে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল সে যুগে ছিল না কোন ডুবুরি। না ছিল কোন জাহাজ, না ছিল কোন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। সেই যুগের মানুষের জানা ছিল না যে সাগরের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ রয়েছে। সাগরের গভীর তলদেশে রয়েছে অন্ধকার একথাও ছিল তাদের অজানা, আসলে এ ধরনের জ্ঞান সেই যুগে কোন মানুষেরই থাকা সম্ভব ছিল না।

প্রফেসর রাও ছিলেন একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিখ্যাত সমুদ্র ভূ-তত্ত্ববিদ।

তিনি বলেন: বিজ্ঞানীরা আজ সাবমেরিনের মাধ্যমে সমুদ্রের অন্ধকারাচ্ছন্নতার কথা জানতে পেরেছে। অথচ আল-কুরআন বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে অনেক আগেই। তিনি গবেষণা করে বলেন, আলাহ সাগর বক্ষের যে অন্ধকারের কথা বলেছেন, তা যে কোন সাগরের জন্য নয়, বরং নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যধারী সাগরের জন্যই আলাহর এ বর্ণনা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে এ জাতীয় অন্ধকার স্তরের দু'টি কারণ-(১) রং এবং (২) আলো।

অর্থাৎ-পানির মধ্যে সাত প্রকারের রং রয়েছে। একটির স্তর অতিক্রম করে অন্যটিতে উপনীত হলেই অন্ধকারের মাত্রা বেড়ে যায়। আর আলো রশ্মি যখন পানিতে পতিত হয়, তখন সাতটি রঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। আর তা হলো রশ্মি যখন মহা সাগরের গভীরে প্রবেশ করে তখন দেখেছি, ওপরের স্তর প্রথম ১০ মিটার পর্যন্ত লাল। অতঃপর ৪৯ মিটার পর্যন্ত কালো, ৫০ মিটারের পরে হলুদ, ১০০ মিটারের পরে সবুজ, ২০০ মিটারের পরে নীল। অতঃপর কঠিন অন্ধকার। এ কারণেই ৩০ মিটার গভীরে পোঁছার পরে কোন ডুবুরির ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বের হলে তা আর লাল রঙ্গের দেখা যায় না। আর এসব কারণেই আলোর স্তরে অন্ধকার ঘটে।

আমরা জানি আলোক রশ্মি সৃষ্টি হয় সূর্য থেকে। আর মেঘমালা সূর্যের নীচে অবস্থান করে একটি প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। এটাই অন্ধকারের প্রথম স্তর। অতঃপর সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপরে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে নিম্নদেশে আরেকটি অন্ধকার সৃষ্টি করে এটা হল দ্বিতীয় স্তর। আর যে সমুদ্রের ঢেউ নেই তথায় আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয় না। আর অপ্রতিফলিত আলোক রশ্মি সমুদ্র বক্ষের অনেক গভীর পোঁছতে সক্ষম। এ ভাবেই মহাসাগরকে দু'টি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। একটি হল উপরিভাগ আরেকটি হল নিম্নভাগ। সাধারণত উপরিভাগ বিশেষভাবে আলো ও উষ্ণতাপূর্ণ। অপর দিকে গভীরাংশ অন্ধকার ও শীতলতায় পূর্ণ। আবার উপরিভাগ ঢেউ দ্বারা চিহ্নিত আর নীচের অংশ শান্ত বলেই পরিগণিত। তবে কোন কোন সময় নীচের অংশেও প্রচণ্ড ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। যা মেরীন বিজ্ঞানীরা ১৯০০ সনে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। সমুদ্রের গহিন অন্ধকারে এবং অতল গভীরে মাছেরাও দেখতে পায় না। অন্য কোন প্রাণীর দেখার বিষয়টি তো প্রশ্নই আসে না। এ সকল বিষয়ে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার অতি সম্প্রতি। অথচ আল-কুরআন এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই। তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, ঢেউয়ের ওপর ঢেউ, বিষয়টি উপলব্ধির জন্য আমরা নিম্নোক্ত বর্ণনাটির প্রতি লক্ষ্য করতে পারি।

সমুদ্রগর্ভে যে অন্ধকার এর ওপর রয়েছে প্রথম ঢেউ, যা সমুদ্রের গভীর অংশকে উপরিভাগ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এ খাতটিও কুরআনে হাকিমে উলেখ রয়েছে, এই যে বিভিন্ন ঢেউ, তরঙ্গ, অন্ধকার, রং ঘনত্ব, উপরিভাগ এবং নিম্নভাগের পার্থক্য, দুই সমুদ্রের মোহনা একই বিন্দুতে মিলন অথচ কেউ কারো সাথে মিশে না। ইত্যাদি বিষয় মেরীন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। অথচ নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা) এর সব জ্ঞান নিখুঁতভাবে প্রচার করেছেন ১৪০০ বৎসর পূর্বেই।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে যে, সাগরের নিচে গভীর অন্ধকারে কি তাহলে সৃষ্টি জীবসৃষ্টি জীব নেই? যদি থাকে তবে তারা কীভাবে দর্শনের কাজ সম্পন্ন করে থাকে?

আধুনিক বিজ্ঞান প্রকাশ করেছে যে, এই সব গভীর অন্ধকারে সে সব কটি পতঙ্গ বসবাস করছে তারা চক্ষু ছাড়া সৃষ্টি, তাদের কোন চক্ষু নেই, দর্শনের কোন যন্ত্র নেই।যেহেতু তাদের দর্শনের কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না সেহেতু তারা গভীর অন্ধকারে বসবাস করছে। আর তাদের রয়েছে শ্রবণ যন্ত্র এরা রাডারের মতো কৌশল দ্বারা হাজার হাজার মিটার নীচে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই এটা সেই স্রষ্টার আলৌকিকতার যিনি সব কিছু জানেন তিনি ভাল ভাবেই জানেন যে, এই সব সৃষ্টি এমন স্থানে অবস্থান করবে যেখানে গভীর অন্ধকার। সেখানে আলোর ব্যবস্থা নেই তাই সেখানে এদের চোখের প্রয়োজন হবে না। অতএব সুন্দর সঠিক ভাবে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করছেন। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে নির্ধারিত পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অধীনে একই পদ্ধতিতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেক জীব।

মহাকাশ জয় ও আল কুরআন :

মানুষ আজ সাধনা গবেষণা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে মহাকাশ জয় করেছে, প্রযুক্তির চরম উন্নতি সাধন করেছে। নভচারীগণ চাঁদে পৌছেছেন, মানুষ যা কল্পনা করেছিল তা বাস্তবায়ন করছে, যেগুলো স্বপ্ন মনে করে ছিল সেগুলো বর্তমানে স্বচক্ষে অবলোকন করছে। আবার কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর নতুন নতুন তথ্য মানুষের নিকট ধরা পড়ছে। অজানা অচেনা অনেক রহস্য উদঘাটন করছে। তবু মানুষ বসে নেই। আরও জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে।
আলাহ্ তাআলা বলেন ঃ
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (سورة الرحمن ٣٣)
হে জ্বিন ও মানবকুল নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করার তোমরা যদি শক্তি রাখ তবে অতিক্রম কর, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (সূরা রাহমান ৩৩)
এ আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ দরকার। সাথে সাথে এ কথাও বুঝান হয়েছে যে, জ্বিন ও মানব জাতি উভয়ই শক্তি অর্জনের মাধ্যমে মহাকাশ জয়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। সেহেতু বাক্যটি শর্তযুক্ত নয় বরং খবর দেয়া হয়েছে। আর জ্বিন ও মানব কে সমপর্যায়ে রেখে বর্ণনা করেছে। এমন এক সময় আসবে যা সেই সময় মানব জাতির কল্পনায়ও আসেনি যে মানব জ্বিন জাতির ন্যায় পৃথিবী থেকে সৌরজগতে পদার্পণ করবে। কেননা কুরআন সেই মহান আলাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। যিনি সার্বিকভাবে সব কিছুই অবগত আছেন যে, মানুষ জাতিও একদিন এমন কাজ করতে সক্ষম হবে। যেমন জ্বিন জাতিরা করতে সক্ষম হয়েছে।
আর জ্বিন জাতি সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বর্ণনা করেন:
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
জ্বিন জাতিরা বলে আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। (সূরা জিন ৮-৯)
জ্বিন জাতি অতীতে আকাশ পরিভ্রমন ও পর্যবেক্ষণ করেছে। আর মানুষও তাদের চেষ্টার পরিপেক্ষিতে বর্তমানে আকাশ পরিভ্রমন ও পর্যবেক্ষণ করছে। যেহেতু জ্বিন ও মানব উভয়ের জন্যই মহান সৃষ্টিকর্তা সকল দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন এবং তা সহজ করে দিয়েছেন।

চলমান সূর্য ও আল- কুরআন :

মানুষ পবিত্র কুরআনকে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এসে পর্যালোচনার মাধ্যমে এর যথার্থ সত্যতা যাচাই করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে প্রথমে ধারণা করে ছিল "সূর্য ঘুরছে, পৃথিবী স্থির। আবার পরবর্তীতে ধারণা করেছে যে সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চতুর্দিকে ঘুরছে আর তাই দিন ও রাতের সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে উক্ত দু'টি মতবাদের কোনটাই সঠিক ছিল না বরং সূর্য ও পৃথিবী সহ মহাশুন্যে যা কিছু আছে সবই মহান শ্রষ্টার বেঁধে দেয়া নিয়মে সুনির্দিষ্ট পথে চলছে। সূর্যের ব্যাপারে কুরআন বলেছে ঃ
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (سورة يس ٣٨)
সূর্য তার নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে গমন করছে। এটা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর সুনির্ধারিত ব্যবস্থা। (সূরা ইয়াছীন ৩৮)
আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, সূর্য তার কক্ষ পথে সেকেন্ডে ২৫০ কিঃ মিঃ বেগে পথ চলে। এই গতিতে চলার সময় প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিঃ মিঃ গতিতে অল্‌কা লাহরীর থেকে বিদ্যুৎ হয়।
মণির উদ্দীন আহমদ স্বীয় কিতাবে উলেখ করেছেন ঃ সূর্য হচ্ছে এ বিশাল সৃষ্টিজগতের একটি সাধারণ নক্ষত্র, তবু প্রখরতা ও উষ্ণতাকে কোনো দিনই কোনো মানবীয় জ্ঞান পরিমাপ করতে পারেনি। প্রতি সেকেন্ডে ৪০ লক্ষ টন হাউড্রোজেন এর থেকে ছিটকে পড়ছে এমন সব তারকালোকে, যার তাপমাত্রা ৫০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতার বিকাশের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানবকুল যত এনার্জি ব্যয় করছে তার চেয়ে দশগুণ বেশী এনার্জি প্রতি সেকেন্ডে সূর্য তার চারদিকে বিতরণ করে যাচ্ছে। যে গতিতে সূর্য তার হাউড্রোজেন ছড়াচ্ছে, তা একটি হাউড্রোজেন বোমার তুলনায় ১০ কোটি গুণ বেশী ক্ষমতা ও গতিসম্পন্ন। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য তার আশে পাশে যে হিলিয়াম নামক তরল গ্যাস তৈরী করছে, তার পরিমাণ

হচ্ছে ৫৬০৪ কোটি টন। এর শক্তি ও প্রখরতা এত বেশী যে, যদি সূচাগ্রও এই ভূমন্ডলের কোথাও গিয়ে পড়ে তাহলে তার ১০০ মাইলের ভেতরে কোন জীব-জন্তু থাকলে তা জ্বলে ছাই-ভস্ম হয়ে যাবে।
এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে প্রতি সেকেন্ডে আরেকটি জ্বালানী গ্যাস নির্গত হয়। বিজ্ঞানীরা যার নাম দিছেন স্পইকুলস। এই গ্যাসের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ৬০ হাজার মাইল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এক অদ্ভুত বিকর্ষণশক্তি তাকে মূহুর্তেই আবার সূর্যের কোলেই ছুড়ে মারে। এই যে অকল্পনীয় ও অস্বাভাবিক জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডলি বানিয়ে রাখা হয়েছে, যার একটি অণু-পরমাণুও যদি ভূলোকে সরাসরি ধাক্কা লাগে, তাহলে গোটা পৃথিবীটাই জ্বলে পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যাবে বলে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আলো বিতরণ করে একে ফুলে ফলে সাজিয়ে দেয়ার এ আয়োজনটকু করেছেন কে? কে এ মহান শক্তিধরকে ধ্বংস করার বদলে গড়ার কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।

সূর্য ও চন্দ্রের নির্ধারিত হিসাব ও আল-কুরআন :

দিন যায় রাত আসে, মাস যায় বছর আসে, সৃষ্টির শুরু থেকে এ বিধান চালু রয়েছে। আলাহ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (سورة الرحمن ٥)

"সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে।" (সূরা রাহমান ৫)

এই সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ কর্ম নির্ভর করে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পৃথিবীতে মানুষের বয়সের সমাপ্তি ঘটছে কিন্তু এই বিশ্বের অত্যাশ্চর্য বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলো রয়েই যাচ্ছে, যা মানুষের বিবেক ও আকলকে হতবাক করে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত হচ্ছে কিন্তু মহা বিশ্বে নিয়ম নীতির কোন ত্রুটি বিচ্চুতি দেখা যাচ্ছে না বরং নিঁখূত ও নির্ভূলভাবে এক বিশেষ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এগুলো কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য কোন ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না।

চন্দ্রের আলো ও আল-কুরআন :

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আবিস্কৃত অত্যাধুনিক যন্ত্র পাতির মাধ্যমে যে দিকেই তাকাইনা কেন সর্বত্র সঠিক নিয়ম শৃংখলা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। পৃথিবীতে বসে রাতের বেলা যদি আমরা চন্দ্রের দিকে নজর দেই তখন দেখতে পাই যে চন্দ্রের মৃদু আলোয় আলোকিত হচ্ছে এই পৃথিবী। বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে চাঁদ এক সময় জ্বলতেছিল। তারপর চন্দ্রের নিজের কোন আলো নেই, অন্যের আলোতে আলোকিত।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (سورة الفرقان . ٦١)

"মহান সেই আলাহ যিনি মহা শূন্যে সৌরজগতসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে একটি আলোক এবং একটি আলোক প্রাপ্ত চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ফুরকান ৬১)
অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

"অতঃপর নিস্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শনকে এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি।" (সূরা ইসরা ১২)
পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়করভাবে আবিস্কৃত সেই গ্রন্থটি আজ ১৪০০ বছর পরেও প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আশ্চর্যজনক নির্ভুলতা ও সঠিকত্বে অতুলনীয়।

আকাশের পরিধি ও আল-কুরআন :

এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আলাহ তা'আলা এই সৃষ্টিতে তার কোন শরীক নেই। আকাশ-পাতাল সাগর ভূমিসহ সকল স্তরে সেই সৃষ্টিকর্তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।
আলাহ তা'আলা বলেন:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (سورة الانشقاق ١٩.)

"তোমরা অবশ্যই (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) ধাপে ধাপে উন্নতির সোপানে আরোহণ করবে।" (সূরা ইনশিকাক ১৯)
নিউটন আবিস্কার করেছে যে, মহা শুন্যে সব কিছুই এক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সুপরিমিতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর তা হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহ নক্ষত্র পরস্পরের আকর্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, পবিত্র কুরআন তাদের এই আবিষ্কারের বহু পূর্বে জানিয়ে দিচ্ছে।

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (سورة الرحمن ٧)

"তিনি আলাহ আকাশকে করেছেন সমুন্নত ও সুপরিমাপ যন্ত্র।" (সূরা রাহমান ৭)

মানুষ যখন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকায় তখন আসমানকে অতি নিকটে ধারণা করে। আসলে প্রকৃত অবস্থা তা নয়।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (سورة النازعات ٢٨.)

"তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।" (সূরা নাযিআত-২৮)

আজকের বিজ্ঞান আমাদেরকে মূল্যবান তথ্যাদি সরবরাহ করছে যে, আমরা যে মহাবিশ্বের অধীন, সেই মহাবিশ্বটি প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোক বর্ষ বিস্তৃত হয়ে মহাশূন্যে অবস্থান করছে। এই মহাবিশ্বের বড় বড় বস্তুসম্ভার হচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ। যে গ্যালাক্সি গড়ে প্রায় প্রতিটি ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র ধারণ করে ক্রমান্বয়ে প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে সম্প্রসারিত হয়ে মহাশূন্যের মাঝে উড়ে যাচ্ছে। এক একটা গ্যালাক্সি প্রায় গড়ে এক লক্ষ আলোক বর্ষ জায়গা নিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে। একটি গ্যালাক্সি থেকে অপর গ্যালাক্সির গড় দুরত্ব হচ্ছে প্রায় ২ মিলিয়ন (২০ লক্ষ) আলোক বর্ষ।
এ পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত সীমারেখায় ১০০ কোটির মত গ্যালাক্সি আবিস্কৃত হয়েছে।
যার ইঙ্গিত করে সৃষ্টিকর্তা বলেন ঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ (سورة الواقعة ٧٥-٧٦)

"অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয়ই এটা এক মহা শপথ যদি তোমরা জানতে।" (সূরা ওয়াকিয়া ৭৫-৭৬)

উর্ধ্বজগত ও আল-কুরআন :

স্বাভাবিকভাবে দর্শনকারী ধারণা করে যে তারকাগুলো অতি কাছাকাছি রয়েছে। অনেকেই আবার এমন অনুমান করে যে, যদি পাহাড়ের উপর উঠা যায় তাহলে হয়তো তারকাকে ধরা যাবে। যেমন ফেরাউন বলেছিল ঃ

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا (سورة الغافر ٣٧)

"হে হামান তুমি আমার জন্য একটি সুউচচ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব আকাশের পথে, অতপর উঁকি মেরে দেখব মুছার ইলাহ-কে।"
সূরা আল-গাফের আয়াত : ৩৭
উর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আজ প্রতিটি শিক্ষিত লোকই জানে, সে এক বিশাল জগৎ। যাকে বলা হয় গ্যালাক্সি। বৈজ্ঞানিকরা এ সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছে, তা আলাহর সৃষ্টিজগতের তুলনায় ক্ষুদ্র একটি বালুকণার চেয়েও নগণ্য। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস এ বিশাল গ্যালাক্সিতে এমন সব বৃহৎকায় তাঁরকারাজি রয়েছে, যার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, এ ধরনের বৃহদাকার লক্ষ লক্ষ তারকারাজিকে গিলে ফেলতে পারে, এ ধরনের অসংখ্য কূপ বা বাকহোল রয়েছে এ গ্যালাক্সিতে।
যার প্রতি আলাহ তা'আলা কুরআনে ইঙ্গিত করে বলেছেন:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ (سورة الواقعة ٧٥-٧٦)

"আমি এ তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয়ই এটা এক মহা-শপথ। যদি তোমরা জানতে পার।" (ওয়াকিয়া ঃ ৭৫-৭৬)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদেরকে আরও জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের ছায়াপথ থেকে আমাদের নিকটতম উজ্জ্বল প্রতিবেশী গ্যালাক্সি এনড্রোমিতার দুরত্বই বিশ লক্ষ আলোক বর্ষ।
পালোমার পর্বতে অবস্থিত প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন ৫০০ সেঃমিঃ টেলিস্কোপ আমাদের দৃষ্টিকে ছায়াপথ পেরিয়ে শতকোটি গ্যালাক্সির সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে দুইশ কোটি বছর লেগে যায়।

উর্ধ্বগমন ও আল কুরআন :

বর্তমানে আমরা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বসবাস করছি, যে যুগে বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চার্য বস্তুর আবিস্কার হচ্ছে যা যুগ যুগ ধরে মানুষ স্বপ্ন বলে কল্পনা করতো। অসম্ভব বলে ধারণা করতো। এমন কি যদি একশত বছর পূর্বে এমন কথা কেউ বলতো তবে তাকে পাগল বলা হতো অথচ বর্তমানে সেগুলো বাস্তবে পরিণত হচ্ছে, স্বচক্ষে অবলোকন করছে। মানুষ আজ উপগ্রহ স্থাপন করছে, আকাশে উড়ছে, চাঁদে পৌছেছে, পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বে ঘুরছে। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে অক্সিজেন পূর্ণ বাতাস এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময় মানুষের এই অক্সিজেনের প্রয়োজন। বিজ্ঞান আরও বর্ণনা করছে, পৃথিবী থেকে উপরের দিকে অক্সিজেনের পরিমাণ কম। এমন কি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ৬৭ মাইল উপরে আর কোন অক্সিজেন থাকে না। তাই মানুষ যত উপরে উঠতে থাকে অক্সিজেন অভাবে তার শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হতে থাকে। অথচ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বে আলকুরআন এসব বর্ণনা করেছে:
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ (سورة الأنعام. ١٢٥)
"আলাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপদগামী করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করেছে।" (সূরা আনআম ৬ঃ ১২৫)
সেই যুগের মানুষ আকাশে আরোহণের উপমাকে কাল্পনিক ধারণা করেছিল। কাল্পনিক ধারণা করাই স্বাভাবিক কারণ সেই যুগে রকেট, বিমান, হেলিকপ্টার কিছুই আবিস্কার হয়নি অথচ আয়াতটি এই ইঙ্গিত বহন করে যে, মানুষ তাদের জীবনে আকাশে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। আর এই উপমা কাল্পনিক নয় বরং বাস্তবিক বর্তমানে মানুষ উর্ধে গমনের মাধ্যমে জানতে সক্ষম হচ্ছেই যে, যত উপরে উঠা যায় তাতে অক্সিজেন ততই কমতে থাকে। বাতাসে অক্সিজেন কম থাকলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, হৃদয় সংকীর্ণ হতে থাকে। মানুষের আকাশে উড়ার ১৩০০ শত বছর পূর্বে কুরআনের এমন তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, এই কুরআন কোন মানুষের রচনা নয় বরং সেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত গ্রন্থ।

বিশ্ব সৃষ্টি ও আল-কুরআন :

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানের আরো মত হলো এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ইন্টারস্টেলার থিওরি মতে। ইন্টারস্টেলার মেটার থিওরি হলো, বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, ধুলোবালি এর মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি। এই থিওরির গ্যাস বলতে মূলত হাউড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসকে বুঝানো হয়। আর ইন্টারস্টেলার ধুলাবালি বা ডাষ্ট বলতে বুঝানো হয়েছে-পানি, বরফ, সিলিকন, গ্রাফাইট তার সাথে যোগ হয়েছে কালো মেঘ, ধুলোবালি এবং গ্যাস। এবার দেখা যাক বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের সাথে এই ইন্টারস্টেলার থিওরির সম্পর্ক কোথায়। ইন্টারস্টেলার থিওরির উপরোক্ত মতে বিশ্ব সৃষ্টির মূল উপাদান মূলত হাইড্রেজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস। কুরআন বর্ণনা করছেঃ
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ (سورة الفصلت ١١
"অতঃপর বিশ্বলোক সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করলেন তা ছিল ধূম্র বা গ্যাস, পরে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে বললেন, অস্তিত্ব সম্পন্ন হও! ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। ওরা বলল আমরা অনুগত হিসেবে অস্তিত্বশীল হলাম। সূরা আদ-দুখান : ১১
অর্থাৎ সমগ্র আকাশ মন্ডল ও গোটা সৃষ্টিলোক ধুম্রাবস্থায় পড়ে ছিল। এই ধূম্র বলতে বাস্পকে বুঝায়। শুধু তাই নয়,বিজ্ঞানীদের মতে আজও হাজার হাজার নক্ষত্র রয়েছে যেগুলোর উপাদান মূলত হাইড্রেজেন গ্যাস। তাছাড়া বিজ্ঞান অনুযায়ী হাইড্রেজেন গ্যাস নিজে জ্বলে। মহাশূন্যের লাখ লাখ নক্ষত্র মূলত এই জ্বলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস।

মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ ও আল-কুরআন :

মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ শতাব্দীর বিশ দশক পর্যন্ত ধারণ করতেন যে, মহা বিশ্ব স্থির রয়েছে। বিজ্ঞানীগণের কাছে প্রকৃত সত্য তখনো এসে পৌছেনি। পরিশেষে আধুনিক বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে যে, মহা বিশ্ব ক্রমান্বয়ে সুষমভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবং পদার্থ বিজ্ঞানীগণ মহা বিশ্বের এই সম্প্রসারনে সমর্থনে বহু বাস্তব থিওরি পেশ করেছেন যা অস্বীকার করার মত নয়। অথচ পবিত্র কুরআন তাদের এই আবিষ্কারের বহু পূর্বে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে এই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছে। আলাহ তা'আলা বলেন:

السماء بنيناها بأيد وأنا لموسعون (سورة الذاريات٤٧)

আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি একে সম্প্রসারিত করেছি। (সূরা জারিয়াত ৪৭)

কুরআনের এই বর্ণনাটি সত্যই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত রায়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। যা শত শত বছর গবেষণার পর বিজ্ঞানীগণ অর্জন করেছেন। তাতে প্রশ্ন দাড়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ১৪০০ বছর পূর্বে তা কি রূপে সম্ভব হলো? এই প্রশ্নটি প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষকেই ভাবিত করবে এবং এর সঠিক উত্তর পেতে হলে আল-কুরআন যে স্বয়ং আলাহর তরফ থেকে প্রেরিত ও সর্বশেষ নবীও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাজিলকৃত এক অলৌকিক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেই হবে।

জোড়া সৃষ্টি ও আল-কুরআন :

সমস্ত মানুষের জানা ছিল যে, পূংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শুধু মাত্র, মানুষ ও জীব জন্তুর মধ্যে রয়েছে। আর উদ্ভিদগুলো জড়পদার্থের মতো, তাতে কোন পূংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ নেই। বর্তমান আধুনিক যুগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে ও বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, গাছপালা ও তরুলতার ফুল ও ফল হয় পরাগায়নের মাধ্যমে অর্থাৎ সেখানের রয়েছে জোড়া জোড়া (পূংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ)। অথচ আল-কুরআন এই অভিনব বৈজ্ঞানিক তথ্যটির কথা বলে রেখেছে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূবে যখন পৃথিবীর কোন মানুষ তা কল্পনাতেও আনতে পারেনি। আসুন তা হলে শোনা যাক আল কুরআনের ভাষায় ঃ

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ (سورة يس ٣٦)

“পবিত্র তিনি যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা জিনিসকে এমন কি জমিন যা উৎপন্ন করে, তাদের (মানুষ) নিজেদেরকে এবং তারা যা জানে না তাও তিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা ইয়াসীন ৩৬)

চিন্তা, দৃষ্টিশক্তি লোপ ও আল-কুরআন :

আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (سورة يوسف ٨٤)

“তিনি (ইয়াকুব আঃ) তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন হায় আফসোস! ইউছুফের জন্য এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট।” (সূরা ইউছুফ ৮৪)

ইয়াকুব (আঃ) তার প্রিয় সন্তান ইউছুফ (আঃ) এর চিন্তার কারণে স্বীয় দৃষ্টি হারিয়েছিলেন ঐ সময় যখন তার অন্যান্য সন্তানরা তাকে সংবাদ দিয়েছিল যে, ইউছুফকে বাঘে খেয়েছে। দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার মাধ্যমে শুভ্রু হয়ে যায়, আধুনিক বিজ্ঞানও বর্ণনা করছে যে, মানসিক দুঃশ্চিন্তার ফলে চোখের উপর কুপ্রভাব পড়ে থাকে, তেমনি চোখের ক্ষতি হয়ে থাকে দুঃশ্চিন্তার কারণে।

ইয়াক্‌তীন বৃক্ষ ও আল-কুরআন :

আলাহ তা’আলা বলেন ঃ

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾(سورة الصافات ١٤٥-١٤٦)

“অতপর আমি তাঁকে (ইউনুস আঃ) এক বিস্তীর্ণ বীজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর উপর ইয়াক্‌তীন (লতাবিশিষ্ট) বৃক্ষ উদগত করলাম।” (সূরা সাফফাত ১৪৫-১৪৬)
তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে সাগরের তীরে বের হয়ে আসলেন। মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আঃ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তার শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না । আলাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার জন্য ইয়াক্‌তীন নামক বৃক্ষ উদগত করে দিলেন। এখন প্রশ্ন হলো অন্য কোন বৃক্ষকে পছন্দ না করে কেন ইয়াকতীন বৃক্ষকে নির্বাচন করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে ইয়াকতীন এমন কাণ্ডবিহীন বৃক্ষ যার পাতাগুলো বড় ও প্রশস্ত এবং তার ছায়া হয় ঘন যা সূর্যের উত্তাপ থেকে ইউনুস (আঃ) কে হেফাজত করে তাকে ছায়া প্রদান করেছেন। এই গাছের পানি তৃষ্ণাকে হালকা করে। এই গাছে এমন পদার্থ রয়েছে যা শরীরকে শক্তিশালী করে। শরীরের চামড়াকে দ্রুত ঠিক করে দেয়। আসলে সেই মূর্তে ইউনুস (আঃ) এই জিনিসগুলোর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, কোন মাছি এই গাছের নিকটবর্তী হয় না। এ ছাড়াও অন্য কোন রহস্য থাকতে পারে যা একমাত্র আলাহই ভাল জানেন।

ঔষধ সেবন ও আল-কুরআন :

আলাহ তা‘আলা বলেন ঃ
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ (ص:٤١-٤٢)
“স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। তাতে গোসল করার জন্য শীতল ও পান করার জন্য ঝরনা নির্গত হল।” (সূরা সোয়াদ ৪১-৪২)
সাইয়্যেদেনা আইউব (আ.) এর রোগের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সেটি কোন রোগ তা উলেখ করা হয়নি। তবে তিনি চর্ম রোগ আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। আসুন তাহলে দেখা যাক কুরআনী চিকিৎসার প্রতি। উলেখিত আয়াতের আলাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন তার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন অতঃপর জমিন থেকে ঠান্ডা তরল বের হবে। তা তিনি পান করবেন এবং তা দিয়ে তিনি তার শরীর ধৌত করবেন। আয়াতটি যদিও ছোট ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু তারমধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে। মহান করুণাময় আলাহ তাআলা আইউব (আঃ) কে কোন কিছু ছাড়াই রোগ থেকে মুক্তি দিতে শক্তি রাখেন কিন্তু পায়ের আঘাত করার আদেশ কিন্তু বর্ণনার মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আসবাব গ্রহণের মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তির জন্য ঔষধ অনুসন্ধান করা সুন্নাত ও আলাহ্‌রই নির্দেশ।
চর্মরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উক্ত আয়াতে সাধারণ নিয়ম নীতির প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। চর্ম রোগের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে খাবার ঔষধ সেবন করা এবং সাথে সাথে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন লোশন ও ক্রীম জাতীয় ঔষধ মালিশ করা। বর্ণনার মাধ্যমে ব্যবহারিক ক্রীমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং বর্ণনার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে সাধারণ নিয়ম যা সেবনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে অনেক চর্ম রোগ নিু তাপ ও ঠান্ডা লোশন ব্যবহারের মাধ্যমে আরোগ্য হয়ে থাকে যার ইঙ্গিত করেছেন।

দুধের কারখানা ও আল-কুরআন :

দুধ মানুষের জন্য এক অপূর্ব নিয়ামত আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যেমে বর্ণনা করছে যে, দুধে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা জমিনের উপরে অন্য কোন খাদ্যে পাওয়া যায় না। রাসূলুলাহ সা. যে কোন খাদ্য খাওয়ার সময় আলাহর কাছে প্রার্থনা করে বলতেনঃ

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه .(ابن ما جة .)

হে আলাহ তুমি যে রিযিক আমাদের কে দান করেছ, তাতে তুমি বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম রিজিক আমাদেরকে দান কর। (ইবনে মাজা)
আর যখন তিনি দুধ পান করতেন তখন বলতেনঃ

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه . (ابن ما جة)

হে আলাহ তুমি যে রিজিক আমাদেরকে দিয়েছো, তাতে তুমি বরকত দাও এবং তা তুমি আমাদেরকে বেশী বেশী দান কর।

এখানে তিনি এই দুধের চেয়ে উত্তমের কামনা করেননি। কারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চেয়ে উত্তম কোন খাদ্য নেই।

ডা. আলমিয়া ইয়াজী বলেন ঃ জীব বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করেছেন যে, গাভী খাদ্যের মাধ্যমে যে সব প্রোটিন খায় তা হিসেব ও ওজন করেছেন এবং গাভীর থেকে যে দুধ বেরিয়ে আসে সেই দুধের প্রোটিন ও ওজন করে দেখেন যে দুধের থেকে যে প্রোটিন পাওয়া গিয়েছে তার ওজন ঐ সব প্রোটিন যা গাভী তার খাদ্যের মাধ্যমে ভক্ষণ করেছে তার চেয়ে বেশী। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুধের এই অতিরিক্ত প্রোটিন কোথা থেকে আসল। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, প্রাণীর পাকস্থলিতে বেশ কিছু ক্ষুদ্র জীবাণু রয়েছে। সেই সব জীবাণু এমন খাদ্য গ্রহণ করে সেগুলোতে প্রোটিন নেই এবং সে গুলোকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে যা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই দুধে মানব শরীরের প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান রয়েছে। তাই এই দুধ সন্তানের জন্য যেমন উপকারী তেমনি উপকারী যুবক, বৃদ্ধ সহ সকল মানুষের জন্য। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, এই দুধ কি করে সৃষ্টি হয়? এ সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (سورة النحل ٦٦)

"নিশ্চয়ই চতুস্পদ প্রাণীর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিখবার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই এদের শরীর থেকে তাদের মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী বস্তু থেকে নিঃসৃত দুধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।" (সূরা নাহল- ৬৬)

এ আয়াত সম্পর্কে ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মুয়ায্যাম বলেন, প্রাণীর মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে দুধ সৃষ্টি কথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য ভিত্তিক, যদিও বিজ্ঞান এ জ্ঞান অর্জন করেছে কুরআন নাজিলের প্রায় ১২০০ বছর পর। গরু, মহিষ, উট, ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি দুধ প্রদান কারী প্রাণী ঘাস ও তৃণলতাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে যা তাদের পরিপাক যন্ত্রে হজম হয়। খাদ্যের পরিত্যাজ্য বস্তুগুলো মল বা গোবর হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। গ্রহণযোগ্য বস্তুগুলো অন্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত শরীরের সকল জীবনকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং কোষ থেকে দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে প্রশ্বাস ও মূত্রের মাধ্যমে পরিত্যাগ করে। সুতরাং পুষ্টিকর বস্তুগুলো রক্তে প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত গ্রন্থি (যেমন দুধের বাট, পিটু, হটারী) দুধ সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে সেগুলোর জীব কোষসমূহ তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো রক্তের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এমনিভাবে দুধের মাখন, চিনি, ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি রক্ত দ্বারা সরবরাহ করা হয়। রক্তের এ বস্তুগুলো খাদ্য থেকে আসে, তা থেকে মল ও মূত্র পরিত্যক্ত হয় আর রক্ত দুধের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে সেসব গ্রন্থি থেকে চলে যায়। সুতরাং মল-মূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থা থেকেই দুধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কত সুন্দর করে এবং কত সংক্ষেপে আলাহ এ কুদরতের বর্ণনা দিলেন। কুরআনের এ ধরনের আয়াত বৈজ্ঞানিকদেরকে আরও গবেষণার প্রেরণা দেবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন এ বৈজ্ঞানিক তথ্যটি প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে নিরক্ষর নবীর উপর নাজিল করা কুরআনে সর্ব প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়। এমনিভাবে আলাহ মানুষকে বস্তুজগতে বহু বিষয়ের অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন যা কুরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সর্বাগ্রে ফলের বর্ণনা কেন? :

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে গোস্তের বর্ণনার পূর্বে ফলের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون (سورة الواقعة ٢٠-٢١)

"আর তাদের পছন্দ মত ফল মূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির গোস্ত নিয়ে (ঘোরা ফেরা করবে)।" (সূরা ওয়াক্বিয়াহ ২০-২১)

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হচ্ছেঃ

وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. (سورة الطور ٢٢)

"আমি তাদেরকে ফল-ফুল এবং মাংস দেব যা তারা পছন্দ করে।" (সুরা তুর ২২)

অপর দিকে রাসূল (সা.) বর্ণনা করেন ঃ

وإذا أفطر أحدكم فليفطر علي تمر فإنه بركة ‘‘عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ،،

তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ইফতার করতে চায় সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা তার ভিতর বরকত রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, গোস্তের আলোচনার পূর্বে ফলের কথা কেন বর্ণিত হলো? আর কেনইবা ফল দিয়ে ইফতারী করার কথা রাসূল সা. বর্ণনা করলেন? তা হলে ফল কি গোস্তসহ অন্যান্য খাদ্য বস্তুর চেয়ে উত্তম? আসুন দেখা যাক, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি বলছে? স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে খাদ্য খাওয়ার পূর্বে ফল খাওয়াতে স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে অনেক উপকার রয়েছে, কেননা ফলে রয়েছে এমন পরিমাণ সুগার যা সহজেই হজম হয়ে যায়। দ্রুত গলে যায়। অল্প সময়ে কয়েক মিটিটের মধ্যে পাকস্থলি সুগারগুলো চুষে নেয়। শরীর তা গ্রহণ করে সুগারের অভাব পুরণ করে এবং ক্ষুধা নিবারণ করে। অপর দিকে যদি কেউ বিভিন্ন খাবার দিয়ে তার পাকস্থলি পূরণ করে, তবে সেই সব খাদ্য পাকস্থলিতে প্রায় তিন ঘন্টার প্রয়োজন হয় হজম হয়ে সেই খাদ্য থেকে সুগার গ্রহণ করতে। অতএব সহজাত সুগার শরীরের বিভিন্ন কোষসমূহের প্রকৃত শক্তির উৎসে পরিণত হয়। বিশেষ করে পাকস্থলির প্রাচীর কোষ সমূহ অল্প সময়ে দ্রুত এই সমস্ত সুগারের মাধ্যমে সজীব হয়ে যায়। তারা পূর্ণ কার্য ক্ষমতা পেয়ে যায়, যার ফলে তার পর যদি অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ করে তা সহজেই হজম করার সাহায্য করে। আর এ কারণেই হয় তো আলাহ রাব্বুল আলামীন গোস্তের পূর্বে ফলের আলোচনা করেছেন। রাসূল সা. এর হাদিসটিও এই হিকমতের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে।

জীবিতকে মৃত্যু থেকে বের করার অর্থ কি? :

আলাহ তাআলা সমস্ত জগতের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। যার ইঙ্গিত দিয়ে আলাহ তা'আলা বলেন:

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب (سورة العمران ٢٧)

তুমি (আলাহ) রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও আর তুমিই জীবিতকে মৃত্যু থেকে বের কর এবং মৃত্যুকে জীবিত থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দান কর। (সুরা আলে-ইমরান-২৭)

মৃতকে জীবিত থেকে এবং জীবিতকে মৃতের থেকে বের করার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, জীব থেকে বীর্য সৃষ্টি করছেন, বীর্য থেকে জীব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে বীর্য আসলে জীবিত, মৃত নয়, তাহলে তার অর্থ দাড়ায় জীবিতকে জীবিত থেকে সৃষ্টি করা। অতএব উলেখিত আয়াতটি এই অর্থের সাথে যথাপোযুক্ত নয়। আর যদি বলা হয় যে আয়াতটির অর্থ আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে অর্থাৎ জীবিতকে মৃত থেকে বের করা হয়েছে। আদম জীবিত আর মাটি মৃত। এটা হতে পারে কিন্তু আয়াতের মাকছুদ বা মূল উদ্দেশ্য কিন্ত তা নয়। আয়াতটিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে এই সৃষ্টিটা সাধারণ দৈনন্দিত যা সংঘটিত হচ্ছে যার প্রমাণ আমরা উক্ত আয়াতটিতেই পেতে পারি। যেহেতু কথাটির পূর্বেই বলা হচ্ছে তুমি রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দাও। আলাহ তা'আলা এমন উদাহরণ আমাদের জন্য পেশ করেছেন যা আমরা সব সময় প্রত্যক্ষ করছি। জীবকে মৃত থেকে বের করার তাফসীর এমন হতে পারে যে জীবিত বিভিন্ন খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সেই সমস্ত বস্তু গুলো হচ্ছে মৃত। অপর দিকে জীবিত থেকে মৃত বের করছে এই যে শরীর থেকে দুধ বের করছেন দুধ হচ্ছে তরল পধার্থ যা মৃত তার মধ্যে জীবন নেই। (আলাহই এর প্রকৃত রহস্য অবগত আছেন)

সমস্ত বিশ্বজগত এক আলাহর সৃষ্টি :

মহান করুণাময় আলাহ রাব্বল আলামীন সৃষ্টি করেছেন আকাশ, বাতাস, চন্দ্র সূর্য, নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত তথা বিশ্ব জগতের সব কিছু। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে রেখে দিয়েছেন লক্ষ কোটি নিদর্শন, যার সব কিছুই প্রমাণ করে যে সৃষ্টিকর্তা এক অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই এ পর্যায়ে নজর দেয়া যাক বিশ্ব জগতের সৃষ্টির মূল মৌলিক উপদানের দিকে।

আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে পরমাণু আর পরমাণু হচ্ছে আসমান ও পৃথিবীর তথা বিশ্ব জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূল বা আসল। বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে পেয়েছেন যে, প্রত্যেক পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণ। চাই সেটি লোহা হোক অথবা গ্যাস হোক অথবা পানি হোক অথবা মাটি হোক না কেন। বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য হতে পারে তবে সবগুলোর মূল পরমাণুতে কোন পার্থক্য নেই। তাই লোহার মূল যেমন ইলেকট্রণ প্রোটন ও নিউট্রণ ইত্যাদি। তেমনি অক্সিজেনে রয়েছে একই জিনিস তবে সেগুলোর সংযোগ সংখ্যা ও গঠন প্রনালী ভিন্ন।

সু-বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি ও পরিচালনায় এসব পরিকল্পনা, সুন্দর ও সঠিক নিয়ম শৃঙ্খলায় নির্ভুলতা ও অসামঞ্জস্য পূর্ণতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহান স্রষ্টা এক অদ্বিতীয় তার কোন অংশীদার নেই ।

মায়ের দুধ ও আল-কুরআন :

মহা গ্রন্থ আল কুরআন বিজ্ঞানকে সকল ভাবে পথ নির্দেশনা দিয়ে আসছে । কুরআনে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে । তন্মধ্যে মায়ের দুধও একটি । এ সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত হচ্ছেঃ

والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين . (سورة البقرة ٢٣٣)

“মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর বুকের দুধ পান করাবে ।” (সূরা বাকারা ২৩৩)
আলাহ রাব্বুল আলামীন উক্ত আয়াতে ‘মা’দেরকে স্বীয় সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর আদেশ করেছেন । এই আদেশের যেমন রয়েছে সন্তানের উপকার তেমনি রয়েছে মায়েদের বহুবিধ কল্যাণ ।
আর যারা এই আদেশ অমান্য করেছে তারা অবশ্যই অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে । স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, মায়ের দুধের বিকল্প নেই । এই দুধের মধ্যে সন্তানের প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে এবং যথাপোযুক্ত সন্তান প্রসবের পর গাঢ় এবং হলুদ রঙ্গের যে দুধ মায়ের স্তন থেকে বের হয়ে আসে তাতে বেশী ভাগই থাকে আমিষ । আর এ আমিষের শতকরা ৯৭ ভাগ ইম্যনে গ্নোরিউলি-এ ওটা হচ্ছে সুনিদিষ্ট রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য, কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞতার কারণে অনেক ‘মা’ই সে দুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর মনে করে গেলে ফেলে দেন যা অনুচিত । মায়ের দুধ যে শুধু স্বাস্থ্য পুষ্ঠি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নয় । উপরক্ত মায়ের দুধ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতাও বাড়ায় ।
অপর দিকে যে মায়েরা সন্তানদের বুকের দুধ পান করান তাদের জরায়ু খুব তাড়াতাড়ি গর্বধারনের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, স্তন ক্যান্সারের সম্ভবনা হ্রাস পায় ।
মনোবিজ্ঞানীগণের মতে, যখন মা তার শিশুকে দুধ পান করান তখন দুধের সাথে অনুভূতিহীন তরঙ্গ ও স্পন্দন সৃষ্টি হয়, এ তরঙ্গই শিশু ও মায়ের মধ্যে ভালোবাসা, ে হ-মমতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা বোধের কারণ হয় ।
মায়ের দুধের তাপমাত্রা থাকে শরীরের জন্য যথোপযুক্ত । সহজেই হজম হয়, কাজে লাগে ও জীবাণু মুক্ত থাকে । আর গরুর দুধ বা কৌটার দুধ সহজেই হজম হয় না, জীবাণু যুক্ত থাকে ও ক্ষতি করে, বিশেষ করে কৌটার দুধ মারাত্মক ক্ষতি করে ।
মায়ের দুধ সন্তানকে রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ও রোগ প্রতিহত করতে ক্ষমতা বাড়ায় । তাই বলা হয়েছে যে দুধ পান করলে মায়ের বুকের দুধ ব্যতীত শিশুর জন্য আর কোন উৎকৃষ্ট উপযোগী ও বিশুদ্ধ খাদ্য নেই ।

নিদ্রা ও আল-কুরআন :

মহা গ্রন্থ আল কুরআন এমনি এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানও যাকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় । বিজ্ঞানীরা যতই গবেষণা করেছে এই কুরআন নিয়ে, ততই তাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সুফল বয়ে আনছে । পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে আলাহ তাআলা বলেন ঃ

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء كم من فضله (سورة الروم ٢٣)

“রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা ও তাঁর কৃপা আকর্ষণ করা তারই (আলাহর) নিদর্শন ।” (সূরা রূম ২৩)
নিদ্রা হচ্ছে জীবনী পন্থা যা অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষ এই নিদ্রার উপর নির্ভর করে । মানুষ তার শরীরের আরাম, ব্রেনের বিশ্রাম ও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য নিদ্রা একান্ত জরুরী । অপর এক আয়াতে আলাহ তাআলা বলেন ঃ

وجعلنا نومكم سباتا (سورة النبأ ٩)

“আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দুরকারী ।” (সূরা নাবা ৯)
এই আয়াতের তাফছীরে বর্ণিত হয়েছে যে, নিদ্রা মানুষের চিন্তা ভাবনাকে কর্তন করে । তার অন্তর ও মস্তিস্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হতে পারে না ।
কীভাবে নিদ্রা সংঘটিত হয় এ সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

فضربنا علي آذاهم في الكهف سنين عددا (سورة الكهف ١١.)

"তখন আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই ।" (সূরা কাহফ ১১)
আসলে নিদ্রা সংঘটিত হয় ঐ সময় যখন জাগ্রত রাখার বহির্গত সব কিছু যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ব্রেনে পৌছে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত হওয়া । সেই সব যত কমতে থাকে ব্রেনের কাজও তত কমতে থাকে । আর সেই গুরুত্ব পূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে প্রথমে শ্রবন, তারপর দর্শন তার পর স্পর্শ ও অনুভূতি ইত্যাদি । আলাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হাশরের পূর্বে মানুষদেরকে তাদের কবর থেকে উঠানোর পন্থা হচ্ছে, শিংগার ফুৎকারের মাধ্যমে এমন বিকট আওয়াজ হবে যা তাদের কর্ন কুহুরে পৌছে দেবে ।
আলাহতাআলা বলেন ঃ

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلي ربهم ينسلون , ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون (سورة يس ٥١-٥٣)

"শিংগায় ফুক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালন কর্তার দিকে ছুটে চলবে । তারা বলবে হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উথিত করল? আলাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন । এটা হবে একটা আওয়াজ সে মূহুর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে ।" (সূরা ইয়াছীন ৫১-৫৩)
ঘুমের বৈশিষ্ট হচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমন্তাবস্থায় অনুমান করতে পারে না যে, সে এই ঘুমে কতুটুকু সময় অতিবাহিত করেছে । আর এরই দিকে কুরআন ইঙ্গিত করে বর্ণনা করছে ।

وكذلك بعثنا هم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم ؟.قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم (سورة الكهف ١٩)

"আমি এমনি ভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে । তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি ।" (সূরা কাহফ ১৯)
প্রকৃত পক্ষে তারা অবস্থান করেছিল ।

ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا (سورة الكهف .٢٥)

তিন শত নয় বছর ।

ঘুমন্ত ব্যক্তি তার চতুর পার্শ্বের সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে যায় । যেন সে মৃত আর তাই পবিত্র কুরআন বিভিন্ন জায়গার ঘুমকে ক্ষণস্থায়ী মৃতুর সাথে তুলনা করেছেন ।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمي (سورة الأنعام٦٠)

"তিনিই তোমাদেরকে রাতের বেলায় মৃত দান করেন এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় কর । অতপর তোমাদেরকে দিবসে সমম্থিত করেন যাতে নিদ্ধারিত সময় পূর্ণ হয় ।" (সূরা আনআম ৬০)
লন্ডনে ড. আর্থার জে এলিসন 'পবিত্র কুরআনের আলোকে আধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা'' -এর উপর গবেষণা করছিলেন । গবেষণাকালে গভীর মনোযোগ এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে তিনি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন । মহা গ্রন্থ আল কুরআনের সত্যতা, বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য এবং সত্যে প্রভাবান্বিত হয়ে পরবর্তীতে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে দীক্ষিত হন । তাঁর ইসলামী নাম আলাহ এলিসন ।
সম্প্রতি মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ড. আলাহ এলিসন বলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের দ্বীন ইসলামের উপর ব্যাপক গবেষণা এবং পড়ালেখা করা উচিত । কেননা একমাত্র ইসলামই এমন একটি ধর্ম যা একই সাথে মানবজাতির অন্তরলোক, বিবেক ও অনুভূতিকে সমভাবে সম্বোধন করেছে । তিনি আরো বলেন, বিশ্বে জ্ঞানের যত দিক আছে, যত শাখা আছে তার সব কিছুই আছে মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে । মহাবিশ্ব সৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি, জীবজগতের যত সব অজানা রহস্য উদঘাটন করেছে চিরন্তন এ আসমানী কিতাব । চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি, এর আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে, পানি-সমুদ্র-বায়ুমন্ডল, বিদ্যুৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ, প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ মহাকাল ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুঁত, নির্ভুল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পবিত্র কুরআন প্রকাশ করেছে ।
ড. আলাহ এলিসন বৃটেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রাধন । তিনি কায়রোর ঐ সম্মেলনে বক্তব্য পেশের এক পর্যায়ে দুঃখ করে বলেন, মুসলমানেরা সার্বজনীন ধর্ম ইসলামের বিজ্ঞান বিষয়ক সব তথ্য এবং বর্ণনাসমূহকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে পরিচিত করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে । তিনি আরো বলেন, আধ্যাত্মিকতা এবং মনস্তাত্বিক বিষয়াবলীর উপর শিক্ষা লাভ করা যায় বৃটেনে এমনি একটি সংস্থায় আমি ছয় বছর পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করি । ঐ পদে কাজ করতে গিয়ে আমার বিভিন্ন ধর্মের উপর তুলনামূলক গবেষেণা বা পর্যালোচনার সুযোগ ঘটে । ''চিকিৎসা বিজ্ঞানে কুরআনের অবদান'' আলোচ্য বিষয়ের উপর

অনুষ্ঠিত কায়রোর ঐ সম্মেলনে ইসলামে দীক্ষিত হবার ঘোষণা প্রদান করে। ড. আবদুলাহ্ বলেন, আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয় ছিল "জীবের নিদ্রা এবং মৃত্যুর মাঝে সম্পর্ক' বিষয়ক। গবেষণার সময় অত্যাধুনিক ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এ গবেষণা কর্মে তিনি ড. ইয়াহইয়া আল মাশরিকীর সাহায্য লাভ করেছেন, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং কায়রো সম্মেলনে ড. এলিসনের সাথে যোগদানের জন্য এসেছিলেন। ড. আলাহ বলেন, যখন তিনি কুরআনের আলোকে অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক চিকিৎসার উপর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন, তখন বিস্ময়কর সব তথ্যাবলী তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। তিনি বলেন, "জীবের নিদ্রাবস্থা ও মৃত্যু সম্পর্কে" আমি একটি সন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে কুরআন অধ্যয়নকালে আমার দৃষ্টি একটি আয়াতের উপর স্থির হয়ে গেল। এ আয়াতটি মানুষের নিদ্রাবস্থা এবং নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া ও মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। ড. আলাহ বলেন, তিনি এবং ড. আল মাশরিকী সম্মিলিতভাবে কুরআন শরীফের এ আয়াতটির উপর ব্যাপক গবেষণাকর্ম চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছেন যে, প্রাণীর 'নিদ্রা ও মৃত্যু' প্রকৃত পক্ষে একই সূত্রে গ্রথিত দুটি বস্তু যাতে রাতের ঘুমের অনেক উপকার রয়েছে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সুস্বাস্থের অন্যতম ও প্রধান শর্ত হল পরিমিত পরিমাণ রাতে নিদ্রা যাওয়া। যারা পরিমিত পরিমাণ নিদ্রা যায় কেবল মাত্র তারাই সজীব প্রাণবন্ত মন নিয়ে দিবস আরম্ভ করে, রাতের ঘুমে কর্মশক্তি ও উদ্যম আনয়ন করে, দেহের ক্লান্তি ও অবসন্নতা দুর করে। আধুনিক বিজ্ঞানে আরও বর্ণিত যে, রাতের অন্ধকারের ঘুম মানুষের জন্য দিনের ঘুমের চেয়ে অনেক গুণ বেশী উপকারী।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ ও আল-কুরআন :

আল-কুরআন যেমন করে রাতে তাড়াতাড়ি নিদ্রা যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তেমনি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে। আলাহ তাআলা বলেন ঃ

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (سورة الإسراء . ٧٨)

"নামাজ কায়েম কর ফজরের নিকটবর্তী সময়ে, নিশ্চয়ই ফজরের সময় পরিদর্শিত হয়।" (সূরা ইসরা ৭৮)
এই নির্দেশের বাস্তবতার লক্ষ্যে মহানবী সা. বলেন ঃ

بورك لأمتي في بكورها .

আমার উম্মতের জন্য প্রত্যুষে বরকত দেয়া হয়েছে।

অন্যত্র তিনি বলেন:

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها .

দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম হলো ফজরের দুই রাকাত নামাজ।

প্রত্যুষে জাগ্রত মানুষের জন্য স্বাস্থ্যগত বহু উপকার রয়েছে। ফজরের সময় বাতাস থাকে ধুলাবালি মুক্ত, পরিবেশ থাকে শান্ত যার ফলে এ সময়টা মানুষের শরীর, স্বাস্থ্য ও ব্রেনের দিক দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। ফজরের মুক্ত ও সুন্দর হাওয়া সকলেই পছন্দ করে থাকে। সকালের এতো সুন্দর পরিবেশ দিন ও রাতের অন্য কোন সময়ের সাথে তুলনা হয় না।

সূর্য উদিত হওয়ার সময় তার কিরনের রং প্রায় লাল হয়ে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তার সুপ্রভাব সবার কাছে সুপ্রসিদ্ধ তা হচ্ছে এই যে, মানুষের শরীর এই কিরনের মাধ্যমে ভিটামিন ডি পেয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি দীর্ঘ ঘুমের পর প্রত্যুষে জাগ্রত হয় সে হৃদরোগ থেকে নিরাপদ থাকে।

মহানবীর শ্রেষ্ঠ মুজিযা আল-কুরআন :

মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত জাহানের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে এই পৃথিবীতে আলাহ তা'আলা মানব জাতিকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর এই খেলাফত যথাযথ বাস্তাবায়ন করার জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন এবং তার জন্য সম্ভব্য সব কিছু ব্যবস্থা করেছেন। তবে শর্ত হলো আলাহর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

মানব জাতির সৃষ্টির ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি বলেন:

وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (سورة الذاريات ٥٦)

"একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি।" (সুরা যারিয়াত ৫১ঃ৫৬)

মানুষ যখন এই চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যময় পৃথিবীতে আলাহর ইবাদতের কথা ভুলে গিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রনায় পথ ভ্রষ্ট হতে থাকে তখন সৃষ্টিকর্তা স্বীয় দয়া ও করুণায় তাদের হিদায়েতের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন।

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা দলের কাছে কোন দূত প্রেরণ করেন, তখন এমন কিছু আলামত তার সাথে পাঠান যাতে তারা আশ্বস্ত হতে পারে যে, সে সত্যিই তার পক্ষ থেকে এসেছে। কোন ব্যক্তি যদি তার সংবাদ বাহকের সত্যতা ও তার পরিচয়ের জন্য আলামত নির্ধারণ করতে পারে আর যিনি আহকামুল হাকিমীন তিনি কি তার স্বীয় নবী ও রাসূলগণের পরিচয়ের জন্য আলামত নির্ধারণ করবেন না?

পৃথিবী সৃষ্টি থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে আলাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ইবাদতের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবীকে দুটি জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন (এক) কিতাব, যাতে রয়েছে আকীদা বা বিশ্বাসের ইলম ও শরীয়তের ইলম (দুই) বুরহান বা মুজেযা যা রাসূলগণের হাত দিয়ে এমন কিছু আলামত প্রকাশ পায়, যা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্য। সৃষ্ট জগতের কেউ অনুরূপ করতে পারে না। অতপর তারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানতে পারে যে, এটা আলাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে অসম্ভব। আলাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক যুগের নবী রাসূলকে সে যুগের জনগনের সাধারণ প্রবনতা অনুপাতে মুজিযা দান করেছেন। ঈসা আ. এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান চরম উন্নতির শিখরে উপণীত হয়েছিল। তাকে মুজিযা দেয়া হয়েছিল মৃত্যুকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টি সম্পন্ন করা এবং কুষ্ঠ রোগাগ্রস্থকে সুস্থ করা। মুসা (আ.) কে যত মু'জিযা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে লাঠিকে সাপে পরিণত করা এবং হাতকে বগলের ভিতর থেকে বের করে শুভ্র করা ছিল প্রধান। যেহেতু সেই যুগে যাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ও প্রচুর প্রভাব ছিল। এমন ভাবেই ইব্রাহিম (আঃ) আগুন থেকে বেরিয়ে আসা, সালেহ (আঃ) এর মু'জিযা পাহাড় থেকে গর্ভবতী উটনী বের হয়ে আসা, ইত্যাদি। আর এই সমস্ত মু'জিযা ছিল স্থান কাল পত্র ভেদে সাময়িক। যেহেতু তারা এসেছিলেন কোন এক সম্প্রদায়ের জন্য, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে এবং কোন এক সীমিত সময়ের জন্য। তাই তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তাদের মু'জিযাগুলোর সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের নবী হলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং শেষ নবী, তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। তিনি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন না। তিনি নির্ধারিত কোন স্থানের জন্য সীমিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমস্ত জাহানের নবী। তাই মহান আলাহ তাঁকে দুই প্রকারের মু'জিযা দান করেছিলেন। এক সমসাময়িক মুজিযা যেমন রাসূল (স.) এর আঙুল থেকে পানি ঝরনা ধরা প্রবাহিত হওয়া।

জাবের বিন আলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

হুদায়বিয়ার দিনে মানুষের পানি শেষ হয়ে পিপাসার্ত হয়ে ছিল। আর নবী করীম সা. হাতে একটি মাত্র ছোট পানির পাত্র ছিল। মানুষেরা পানি নেয়ার জন্য নবী করীম সা. এর কাছে দ্রুত গমন করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল ঃ আমাদের কাছে খাওয়া ও ওজু করার কোন পানি নেই। অতপর রাসূল সা. স্বীয় হাত পানির পাত্রটির মধ্যে রাখলেন। আর ঝরনা ধরার ন্যায় পানি তার আঙুল থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। আমরা সবাই পানি পান করলাম ও ওজু করলাম। এক প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনাকারী বর্ণনা করলেন যে, আমরা ছিলাম ১৫০০ জন। এমন কি আমরা যদি এক লাখ হতাম, তারপর সেই পানি আমাদের যথেষ্ট হত। (বুখারী) এমনভাবে অল্প খানা বেশী হওয়া, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, মেরাজে গমন ইত্যাদি ছিল রাসূল সা. এর সমসাময়িক মুজিযা।

(দুই) চিরন্তন মুজিযা ঃ আলাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠও চিরন্তন মুজিযা হিসেবে আল-কুরআনকে নির্বাচন করেছেন। আল-কুরআনের অলৌকিকতা চিরস্থায়ী, সব সময়, সর্ব যুগেই। এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাব মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না, তাই তাঁর নবুয়তের দাবি ও দাওয়াতের সঠিকতার প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। বর্তমানে মানুষ পবিত্র কুরআনের মাঝে ধারাবাহিকভাবে নিত্য নতুন অলৌকিকতার সন্ধান পাচ্ছে, যার কোন শেষ নেই। এই কুরআনের রয়েছে বর্ণনা নৈপুণ্য, পরিধি নিরূপণ, অতি অল্পে বিশাল বর্ণনা, অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গি, অতি উচ্চাঙ্গের উপমা, ভাবের গাম্ভির্য, অর্থের বিশুদ্ধতা, চিত্তাকর্ষক সু-বিশাল সাবলীল গাঁথুনি। এই কালজয়ী গ্রন্থে যেমন রয়েছে জ্ঞানের প্রসার, যুক্তির দৃঢ়তা ও তথ্যের নির্ভুলতা, তেমনি রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানব জীবনের প্রত্যেক দিকের পরিপূর্ণ আলোচনা। বিশ্ব পরিচালনায় সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান। এ ছাড়াও রয়েছে জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান সহ সব ধরনের জ্ঞানের সমারোহ।

আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

ما فرطنا في الكتاب من شيئ (سورة الأنعام ٣٨)

"এই কিতাবে কোন কিছু বাদ দেয়া হয়নি।" (সুরা আনআম ৩৮)

এটা সবার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যারাই কুরআনের সামনে দাঁড়িয়েছে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এটা এমন একটা কিতাব যা পৃথিবীর সকল কিতাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। সে সম্পর্কে মহানবী (স.) বলেন ঃ এটা আলাহর কিতাব যাতে রয়েছে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল আদম আঃ এর যুগ থেকে নিয়ে রাসূল (স.) এর প্রেরণ পর্যন্ত সকল উম্মত, নবী ও রাসূলগণের সংবাদ। এই কুরআনের মধ্যে আরও রয়েছে রাসূল (স.) এর পরে যা আসবে তার খবর। তন্মধ্যে-রয়েছে আখেরি জমানার খবর, কিয়ামতের খবর, হাসরের খবর, জান্নাতের খবর ও জাহান্নামের খবর। এতে তোমাদের সব ধরনের বিচার ফয়ছালা রয়েছে। এটি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। তা কখনই দুর্বল নয় যে ব্যক্তি অহংকার বশত এটা ছেড়ে দেয়, আলাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন ছাড়া অন্য কোথাও হেদায়েত অন্বেষণ করে, আলাহ তাকে পথ ভ্রষ্ট করেন। এই কুরআন হচ্ছে আলাহর সুদৃঢ় রশি, জ্ঞান গর্ব জিকর, সরল সঠিক পথ, যার দ্বারা কোন প্রবৃত্তি বাঁকা পথে চলে না। কোন ভাষা সেখানে সংমিশ্রণ হয় না। বিজ্ঞানীগণের চাহিদা এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয় না, অতিরিক্ত উত্তরের সৃষ্টি হয় না। এবং তার অলৌকিকতা শেষ হয় না। (তিরমিজী)

হ্যাঁ কুরআন কোন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান এবং অন্য কোন বিজ্ঞানের কিতাব হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি ঠিক, তবে এই কুরআন হচ্ছে মানব জাতির সার্বিক জীবন ব্যবস্থা ও চলার পথ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেখানে সব ধরনের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে এবং প্রত্যেকটার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আলাহ তা'আলা বলেন:

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ,وكان الإنسان أكثر شيء جدلا(سورة الكهف ٥٤)

আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছি। (সূরা কাহাফ ৫৪)

অপর দিকে মহান স্রষ্টা এই কুরআনকে জ্ঞান ভাণ্ডার হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। আর তাতে মানব জাতিকে সকল বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। কেননা এ সৃষ্টি জগৎ যেন এক মহান প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞানময় স্রষ্টার সুনিপূণ সৃষ্টি কৌশলির বিজ্ঞান মেলা। আলাহর বাণী বাস্তবায়নার্থে প্রতিদিন সৌরজগৎ ও মানব জীবনের মধ্যে নিত্য নতুন আলাহর আয়াত বা নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে। আর কেনইবা তা প্রকাশ পাবে না, যেহেতু তিনি বলেছেন:

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق (سورة فصلت ٥٣)

আমি শীঘ্র তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দিব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এটাই সত্য। (সূরা ফুচ্ছিলাত- ৫৩)।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে কুরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক আলোচনা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। এবং ইসলামের প্রতি আহ্বানের মাধ্যম সমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পন্থায় পরিণত হয়েছে।

তাই চলছে সাধনা ও গবেষণার জগতে এক বিস্ময়কর জাগরণ। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে কুরআনের যথার্থতা ও সত্যতা শুধু স্বীকারই নয় বরং আজ তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এমন কি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত জ্ঞান বিজ্ঞানের রাস্তা বর্ণনা করেছে। তাই শত শত বিজ্ঞানী ফিরে আসতে শুরু করেছে ইসলামের ছায়া তলে। ঈমান এনেছে মহান স্রষ্টার প্রতি। স্বীকার করছে আলকুরআন নিঃসন্দেহে আলার বাণী এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁরই প্রেরিত রাসূল। অবস্থা বেহাল দেখে বর্তমানে ইহুদি খ্রিস্টান সহ অমুসলিমরা বিভিন্ন পন্থায় ইসলামের প্রতি আঘাত হানতে শুরু করেছে। রাসূল (সা.) এর সুনাম ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। তারা আলাহর রাসূলের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। অতীতেও এ ষড়যন্ত্র হয়েছে। মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম প্রেরিত হয়েছেন ১৪০০ বছরের বেশী হয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনও শক্তিশালী হচ্ছে এবং ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে। এবং এমন দরিদ্র ও মূর্খ পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছেন যারা অগ্রগতি ও আধুনিকতা জানত না। আর তিনি লেখা-পড়াও জানতেন না। তিনি ছিলেন উম্মি, তিনি কোন স্কুল মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেননি। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বেরিয়ে আসেননি। অতঃপর তিনি সূক্ষ্ম, অতি আশ্চর্য নিয়মনীতি, আইন-কানুন নিয়ে এসেছেন যা দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করেছেন, এবং যা দিয়ে মানবতা উপকৃত হয়েছে। তাঁর অনুসারীগণ সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন, আর তাতেই ছিল মানব জাতির সমস্ত কল্যাণ। আর তাতে ছিল আদল, ইনসাফ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও চারিত্রিক উন্নতি। এমন কি তারা সুমহান উচ্চ আসনে উপনীত হয়েছিলেন। অতএব এটা কি জ্ঞানের কথা হতে পারে যে, তিনি তাঁর নিজের থেকে দ্বীন ধর্ম নিয়ে এসেছেন? না, বরং এ হলো আসমান থেকে অবতীর্ণ ওহি। আবূ সুফিয়ান ছিল মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের সব চেয়ে বড় দুশমন ও শত্রু, এমন কি সে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারপর আলাহ তাকে ইসলামের দিকে হিদায়েত করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি ঐ সময়

অতিবাহিত করেছি যে সময় আমার ও রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের মাঝে সন্ধির কথাবার্তা চলছিল। তিনি বলেন ঃ আমি যে সময় শামে ছিলাম সেই সময় রোমের বাদশাহ হেরাকালের কাছে রাসূলুলাহ সালালাহ আলাইহি ওয়া সালামের পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে আসল। অতঃপর হেরাকাল বললেন ঃ যে মানুষটি নিজেকে নবী বলে ধারণা করছে সেই ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কেউ কি এখানে আছে? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ কুরাইশের সেই দলের মধ্য থেকে আমাকে ডাকা হলো। তারপর আমরা হেরাকালের দরবারে প্রবেশ করলাম। তার সামনে আমাদেরকে বসানো হলো। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে ধারণা করছে সেই ব্যক্তির বংশের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকটতম কে? আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি। তারপর আমাকে তার কাছাকাছি বসাল, আর আমার সাথিদেরকে আমার পিছনে বসাল। তার দোভাষীকে ডাকা হলো। অতঃপর তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তাদেরকে বলো, আমি তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব যে নিজেকে নবী বলে ধারণা করে ও বলে। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আলাহর কসম! আমার উপর মিথ্যার প্রভাবের যদি ভয় না থাকতো তাহলে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। তারপর তিনি তার দোভাষীকে বললেন ঃ তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যে তিনি কেমন বংশের? আমি বললাম ঃ আমাদের মাঝে তিনি উচ্চ বংশওয়ালা।

তিনি বললেন ঃ তার বাপ-দাদার মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল?

আমি বললাম ঃ না!

তিনি বললেন ঃ তিনি যা বলছেন তা বলার পূর্বে তোমরা কি তাকে মিথ্যার অপবাদ দিতে?

আমি বললাম ঃ না!

তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝ থেকে যারা তার অনুসরণ করছে তারা কি সম্ভ্রান্ত লোকেরা অথবা দুর্বল লোকেরা?

আমি বললাম ঃ বরং দুর্বলেরা।

তিনি বললেন ঃ বরং দুর্বলেরা।

তিনি বললেন ঃ তারা কি বেশী হচ্ছে, না কমছে?

আমি বললাম ঃ না বরং তারা বেশী হচ্ছে।

তিনি বললেন ঃ তাঁর দ্বীন থেকে তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাদের মধ্যে থেকে কেউ কি মুরতাদ হয়ে ফিরে এসেছে?

আমি বললাম ঃ না।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের যুদ্ধ তার সাথে কেমন ছিল?

আমি বললাম ঃ কখনও তিনি জয়ী হয়েছেন এবং কখনও আমরাও বিজয় লাভ করছি।

তিনি বললেন ঃ তিনি কি প্রতারণা করেন?

আমি বললাম ঃ না, তবে আমরা তার সাথে সন্ধি করতে যাচ্ছি। জানি না এ ব্যাপারে তিনি কি করবেন।

তিনি বললেন ঃ এমন কথা তার পূর্বে কি কেউ বলেছে ?

আমি বললাম ঃ না।

তিনি তার দোভাষীকে বললেন ঃ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি তার বংশের ব্যাপারে। অতঃপর আমি ধারণা করেছি যে, তোমাদের মাঝে তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের। আর এমনভাবেই রাসূলগণ প্রেরিত হন তাদের সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্য থেকে। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি ঃ তার বাপ-দাদার মধ্যে কি কোন বাদশাহ ছিল? আমি ধারণা করেছি যে, ছিল না। অতঃপর আমি বললাম ঃ যদি তার বাপ-দাদার মধ্যে কোন বাদশাহ থাকতো তাহলে বলতাম, লোকটি তার বাপ-দাদার রাজত্ব কামনা করছে। আমি তোমাকে তার অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে, তারা কি দুর্বল, না সম্মানিত ব্যক্তি? অতঃপর তুমি বলেছ, তারা হলো দুর্বল। আর দুর্বলরাই হচ্ছে রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, তোমরা কি তাকে এমন কথা বলার পূর্বে মিথ্যা বলতে দেখেছিলে? অতঃপর ধারণা করেছি যে, না। অতঃপর অবগত হয়েছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে মিথ্যা দাবি করে না সে কখনও আলাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারে না। এরপর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাদের মধ্যে কেউ কি তার প্রতি রাগ করে তার ধর্ম থেকে ফিরে এসেছে?

অতঃপর আমি ধারণা করেছি যে, না। আর এমনটাই হচ্ছে ঈমান, যদি তা হৃদয়ের পর্দায় মিশে যায়। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, তারা কি সংখ্যায় বেশী হচ্ছে, না কমে যাচ্ছে? আর আমি ধারণা করেছি যে, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর এমনটাই হবে ঈমান পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, তোমরা তার সাথে যুদ্ধ করেছ। আর যুদ্ধটা হবে তোমাদের ও তার মাঝে এমনভাবে যে তিনি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন এবং তোমরাও তার উপর বিজয়ী হয়েছ। আর এমন ভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন। সবশেষে শেষ ফল তাদেরই পক্ষে হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি প্রতারণা

করেন? অতঃপর আমি ধারণা করেছি যে, তিনি প্রতারণা করেন না। আর রাসূলগণ এমন ভাবেই ধোঁকা বা প্রতারণা করেন না। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, তার পূর্বে কেউ কি এমন কথা বলেছে? অতঃপর আমি ধারণা করেছি যে, না। তারপর আমি বলেছি যে, তার পূর্বে বলেছে এবং তিনিও বলছেন। তিনি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করেন? তুমি বলেছ যে, তিনি বলেন ঃ তোমরা একমাত্র আলাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করনা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলেছে তা ছেড়ে দাও। এবং আমাদেরকে সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, দান-সাদ্কা করা, পবিত্র থাকা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার আদেশ করেন।

তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য বলে থাক তাহলে নিশ্চয়ই তিনি হচ্ছেন নবী। আর আমি জেনে নিলাম যে, তিনি আবির্ভাব হয়েছেন। আর এমন ধারণা আমি তোমাদের থেকে করিনি। আমি যদি জানতে পারতাম তাহলে অবশ্যই তার প্রতি একনিষ্ঠ হতাম এবং অবশ্যই তার দর্শন আমি ভালোবাসতাম। আমি যদি তার কাছে থাকতাম তাহলে অবশ্যই তার কদম দু'টি ধৌত করতাম, আর তার রাজত্ব আমার পায়ের নিচ পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

তিনি বললেন ঃ তারপর রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের পত্রটি আনতে বললেন, অতঃপর পাঠ করলেন। আর তাতে লেখা ছিল ঃ

আলাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের বাদশাহ হেরাকালের প্রতি। যারা হিদায়েত অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকবে এবং আলাহ তোমাকে দুই বার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যদি তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তোমার উপর সমস্ত আবিসিনিয়ার গুনার ভার পতিত হবে।

হে আহলে কিতাব। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্য সাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে ফিরে এসো, যেন আমরা আলাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন অংশী স্থাপন না করি এবং আল-াহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে রব রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল ঃ সাক্ষী থেকো যে, আমরা আলাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সূরা আল ইমরান, ৩ ঃ ৬৪ আয়াত)।

আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ তিনি যা বলার বললেন এবং পত্রটি পড়া শেষ করলেন। তখন তার কাছে আওয়াজ বেশী ও বড় হলো, আর আমরা বের হয়ে আসলাম। অতঃপর আমি আমার সাথিদেরকে বললাম ঃ লোকটি অর্থাৎ মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের শান বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তাকে বনী আসফারের বাদশাহ অর্থাৎ রোমের বাদশাহ ভয় করছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আলাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আলাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।' (সূরা তাওবাহ, ৯ঃ৩২ ও ৩৩ আয়াত)।

এ সম্পর্কে আলাহ বলেন ঃ

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون (سورة الصف ٨)

তারা আলাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আলাহ তার নূর পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেরেরা তা অপছন্দ করে। (সূরা ছাফ্ ৮)

অতএব (ওহে মুসলিম জাতি) তোমরা নিরাশ হয়োনা ও বিষণ্ন হয়োনা এবং যদি তোমরা মুমিন হও তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে। (সূরা আল ইমরান) ১৩৯

ইসলাম সত্য ধর্ম যা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্যের সাথে মিলে যায়। সর্বাবস্থায় সত্যকে সহযোগিতা করে, সর্বাবস্থানে সত্যকে সংরক্ষণ করে। ইসলাম জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি আলাহ তাঁর পরিচয় জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করেছে। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

فاعلم أنه لا إله إلا الله (سورة محمد ١٩)

সুতরাং ইল্ম গ্রহণ কর, যে আলাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই (সূরা মুহাম্মাদ-১৯)

বস্তুবাদের জ্ঞান লা ইলাহা ইলালাহ এর সাক্ষ্যর বিপরীত নয়। বরং এই সাক্ষ্যটিকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাধ্যমে গভীর ভাবে সুদৃঢ় করে। বস্তুবাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করছে যে, আল কুরআন আলাহর পক্ষ থেকে সত্য গ্রন্থ। সব জ্ঞানের ঊর্ধ্বে হলো কুরআনের জ্ঞান। আলকুরআন গবেষকদের গবেষণার পূর্বেই সব কিছুর বর্ণনা দিয়েছে, এই কুরআনের জ্ঞান পৃথিবীর বুকে প্রকৃত তথ্যের বর্ণনা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে কেননা আলাহ তা'আলা বলেন: আমি সত্যসহ-এ কুরআন নাজিল করেছি এবং সত্যসহ নাজিল হয়েছে। (সূরা ইসরা ১০৫)

আলাহ রাব্বুল আলামীন সত্যও শান্তির পথে সঠিক ভাবে চলার জন্য এ যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বনবীর মাধ্যমে আল্ কুরআনকে সরাসরি মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন । সেই সাথে মানুষকে ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা দান করেছেন । সেই বুদ্ধি ও বিবেকের সহায়তার ঐশী বাণী সমূহের যথার্থ অনুধাবন এবং সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই একজন মানব সন্তান প্রকৃত মানব হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে । আর এ সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে কেবল বিভ্রান্তির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে ইহকালীন ও পরকালীন চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব । স্বয়ং নবী করীম (সা.) এর উপর নাজিলকৃত আল কুরআন হল চিরন্তন ভাবে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম জীবন বিধান । ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি ও চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্ কুরআন ও রাসূল (আঃ) এর আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কোন বিকল্প নেই ।

মান্না সালওয়া ও আল্ কুরআন :

আলাহ রাব্বুল আলামীন বণী ইসরাইলদের প্রতি মান্না ও সালওয়া পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন । মান্না হচ্ছে মধুর মত মিষ্টি জাতীয় পানীয় বস্তু, আর সালওয়া হচ্ছে এক প্রকার পাখির ভুনা গোস্ত । এ দুটি বেহেস্তিখানা বেহেস্ত থেকে বনী ইসরাইলদের জন্য প্রতি দিন আসত । এ সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنا كم (سورة البقرة .٥٧)

(হে বনী ইসরাইল) আমি তোমাদের প্রতি পাঠিয়েছি মান্না ও সালওয়া এবং আমি তোমাদেরকে সব ভাল জিনিস দিয়েছি তা তোমরা ভক্ষণ কর ।(সূরা বাকারাহ-৫৭)

কিন্তু বনী ইসরাইল এই খাদ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করেনি । যেমন আলাহ
তা'আলা তাদের ভাষায় বলেন ঃ

يا موسى لن نصبر علي طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها و فومها وعدسها وبصلها (سورة البقرة ٦٠)

হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য দ্রব্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করতে পারব না । কাজেই তুমি তোমার পালন কর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তু সামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ ইত্যাদি । (সূরা বাকারা ৬০)

আলাহ তা'আলা তদুত্তরে মুসা (আঃ) এর জবানে বললেন ঃ

قال اتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير(سورة البقرة .٦١)

তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও । (সূরা বাকারা ৬১)

এখন প্রশ্ন হলো, আলাহ রাব্বুল আলামীন মধুর মত মিষ্টি জাতীয় ও পাখির গোস্তকে কীভাবে বিভিন্ন তরিতরকারির চেয়ে উত্তম বললেন? অথবা সেগুলোর উপর প্রাধান্য দিলেন?

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে, শরীরের মধ্যে ২২টি অ্যাসিডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন উৎপন্ন হয় । অন্য প্রকারের এমন কিছু রয়েছে যা তৈরি হতে পারে না বরং তা খাদ্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে হয় ।

প্রোটিন সমূহ দু'ভাগে বিভক্ত ।

পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ প্রোটিন যা মাংসের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে । অসম্পূর্ণ প্রোটিন যা সবজির মধ্যে রয়েছে । এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই জীব প্রোটিন বিশেষ করে মাংসকে সবজি প্রোটিনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন যা ছাড়া মানুষের দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয় (প্রকৃত রহস্য আলাহই ভাল জানেন)

মানব জন্ম ও আল্ কুরআন :

আমরা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বসবাস করছি । এ যুগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে । এখনই সময় এসেছে কুরআনকে বুঝার । আসুন তাহলে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ছোট একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করি । মহান আলাহ তা'আলা ঐশী গ্রন্থ আল্ কুরআনে বর্ণনা করেন:

فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب (سورة الطارق ٦-٨)

মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্খলিত পানি থেকে এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্য থেকে। (সূরা তারেক ৬-৮)
এই আয়াতটি মানুষের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করছে, যাকে দুর্বল ও তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা স্খলিত হয়।
অপর আয়াতে আলাহ্ বলেন ঃ

ألم يك نطفة من مني يمنى (سورة القيامة ٣٧)

সে কি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? (সূরা কিয়ামত ৩৭)

আল্ কামুছ আল্ মুহিতে বর্ণিত স্খলিত পানি নির্গত হয় বিশেষ করে পুরুষ থেকে। মহিলা থেকে বেগবান কোন পানি নির্গত হয় না।
জনৈক উস্তাদ বর্ণনা করেছেন: এক ব্যক্তি একজন মুফ্‌তী সাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এক বিছানায় স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে ছিল। সকাল বেলায় দেখতে পায় যে, বিছানার চাদরের উপর একটি বীর্যপাতের আলামত রয়েছে। কার সে বীর্য কেউ বলতে পারছে না। এখন কার উপর গোসল ফরজ হয়েছে? তাদের পরনের কাপড়ে কোন চিহ্ন নেই। স্বপ্নদোষ কার হয়েছে কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারছে না। মুফতী সাহেব বললেন: বীর্যের চিহ্নটি যদি লম্বা লম্বি হয়ে থাকে তবে পুরুষের আর যদি গোলাকার হয়ে থাকে তবে তা মহিলার যে হেতু পুরুষের বীর্য স্খলিত বা বেগবান অবস্থায় বেরিয়ে আসে। আর মহিলার বীর্য স্বাভাবিক অবস্থায় বেরিয়ে আসে যা স্খলিত হয় না।
অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টিকরা হয়েছে এমন একটি স্থান থেকে যার অবস্থান হলো মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্যবর্তী।
আমরা এই ধরনের আয়াত বহু বার পাঠ করি এবং বহুবার শ্রবণ করি কিন্তু আমাদের মাঝে খুব কম সংখ্যক লোক রয়েছে যে এ ধরনের আয়াত থেকে কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা অনুধাবন করতে পারে এবং তারা বলতে বাধ্য হয় যে, কোন মানুষের কথা হতে পারে না বরং এ হচ্ছে মানুষের সৃষ্টিকর্তার বাণী যিনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান রাখেন। প্রথমে আমাদের জানা উচিত কুরআন নাজিলের সময় থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও আলেম গণ কি ভাবতেন। অতীতে মানুষ ধারণা করতো যে, পুরুষের বীর্য তৈরি হয় তার পিঠে আর মহিলার তৈরি হয় তার পাঁজরায়। আর এ দুটির মাধ্যমে সন্তান জন্ম নেয়।
আলাহর বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে আব্বাস বলেন: পুরুষের মেরুদণ্ড আর মহিলার পাঁজরার হাড় এ দুটির মাধ্যমে সন্তান হয়।
আবার কেউ বিশ্বাস করতো যে, পুরুষের বীর্য তার মেরুদণ্ড ও তার পাঁজরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয় অর্থাৎ পুরুষের মেরু দণ্ডে তার বীর্য জমা থাকে। প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন যে, সহবাসের কারণে অনেকেই পিঠ ও মেরুদণ্ডে ব্যথা অনুভব করেন এজন্য যে, সেখানে পানি কম হয়ে যায়। আবার কেউ ধারণা করেন যে, পুরুষের বীর্য তার মগজ থেকে নেমে আসে। অতঃপর তার অণ্ডকোষে জমা হয়। এ ব্যাপারে তারা বলেন যে, এ ধারণা কুরআনের আয়াতের বিপরীত নয় কেননা বীর্য যখন ব্রেন থেকে তা নিচে নেমে আসে তখন মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড়ের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হয়।
পবিত্র আয়াতটি আলেম ও তাফছীরকারগণকে হয়রান পেশানির মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। কীভাবে স্খলিত পানি মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। আয়াতটির ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষের নালিতে অল্প অল্প করে সংঘটিত হতে থাকে। তারপর তা পরিপক্ব ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে মণির ছোট থলিতে পৌঁছে যায়। যৌন উত্তেজনার মাধ্যমে মূত্র চলার রাস্তার মাধ্যমে অন্তিম মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে শরীরের বাহিরে বের হয়। এ প্রক্ষিপ্ত পানি বলতে সাধারণত পুরুষের বীর্যকেই বুঝায়। কারণ দৃশ্যত ইহাই যৌন মিলনের ফলে স্ত্রীর যোনিগর্ভে সবেগে স্খলিত হয়।
আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে, পুরুষের প্রজনন কার্যবিধি তিনটি ধাপে বিন্যাস করা যায়।
১.শুক্র কীট ও যৌনরস তৈরী করা।
২.যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন করা
৩.শুক্র কীট তৈয়ারি ও যৌন ক্রিয়ার বাস্তবায়নে স্নায়ু তন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ।
বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, পুরুষের অণ্ডকোষ ও মহিলার ওভাম তৈরি হয় মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় শিশুর মেরুদণ্ড ও পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বংশবাহী নালির মাধ্যমে । অতপর অণ্ডকোষ আস্তে আস্তে নিচে নামতে নামতে শরীরের বাহিরে অবস্থান নেয়। গর্ভ ধারণের সপ্তম মাসের

শেষের দিকে। আর মেয়ে হলে তার ওভাম নিচে নেমে তার যথাস্থানে এসে অবস্থান নেয়। তারপরও সেগুলোর প্রয়োজনীয় সব কিছুই আসে মেরুদণ্ড ও পাঁজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের মধ্য দিয়ে।
এ বিষয়টি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ডা. হেমায়েতুলাহ, তিনি লিখেছেন ঃ প্রতিটি সন্তানের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরী হয় এক কোষ ভ্রূণ বৃদ্ধি পেয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে। সে মতে অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় তৈরী হয় বুকের ভিতরের শেষের ৩টি ১০, ১১, ও ১২ নং বাঁকা হাড় যা পিঠের মেরুদণ্ডের হাড়ের সাথে যে স্থানে লাগানো থাকে সেখানকার মেসোনেফ্রনস থেকে প্রকাশ থাকে যে, মানুষের বুকের এক পার্শ্বে ১২টি এবং অপর পার্শ্বে ১২ টি মোট ২৪ টি লম্বা বাঁকা হাড় থাকে। উপর থেকে নিচের দিকে ১, ২, ৩ করে ক্রমান্বয়ে ১১, ১২ নাম্বার দিয়ে হাড়গুলি গণনা করা হয়। এগুলোকে পাঁজরের হাড় বলে।
মাতৃ গর্ভের ২ মাস বয়স থেকে পুরুষ সন্তানের অণ্ডকোষ আর মেয়ে সন্তানের ডিম্বাশয় উপরোক্ত মেসোনেফ্রনস থেকে নিচে নামতে থাকে এবং জন্মের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এগুলো নিচে নেমে আসলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত যে, এদের নার্ভ (স্নায়ু) কন্ট্রোল উৎপত্তি স্থান মানে ১০, ১১, ও ১২ নাম্বার বুকের হাড় মেরুদণ্ডের যে স্থানে লাগানো থাকে সে স্থান থেকে যে নার্ভ বের হয়ে আসে সে নার্ভের মাধ্যমে এ নার্ভই উত্তেজনা মিলনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং বীর্য নির্গত করে।
যদি কোন কারণে এই নার্ভ কাজ না করে বা অকেজো হয়ে যায় তখন স্বাস্থ্য যতই ভাল থাকুক না কেন সংগম করতে অক্ষম হয়ে যায়। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষত্বহীনতা বলে।
ভ্রূণবিদ্যা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত কে জানতো যে অণ্ডকোষ ও ডিম্বাশয় পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডের সাথে বুকের হাড়ের মিলন স্থানের মেসোনেফ্রনস থেকে তৈরী হয় এবং মানুষের উত্তেজনা মিলনের কার্যক্রম ওখান থেকে উৎপন্ন নার্ভের উপর নির্ভরশীল। অথচ ১৪০০ বছর পূর্বে যখন মানুষ ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কিছুই জানত না তখন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিচ্ছে:

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب (سورة الطارق ٥-٧)

অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ববেগে নির্গত তরল পদার্থ থেকে যা নির্গত হয় পিঠের মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য হতে। (সুরা তারিক ৫-৭)

অদৃশ্য সংবাদ প্রদানে আল্ কুরআন :

পবিত্র কুরআনে আলাহ রাব্বুল আলামীন কিছু অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেছেন যে তা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর তা হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে যে ভাবে কুরআন বর্ণনা করেছে। আর তা মু'মেন, কাফের, সৎ, অসৎ সবাই জানতে পেরেছে।
প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যে, তারা ভবিষ্যতের অনেক খবর প্রদান করে কিন্তু কিছু বাস্তবায়িত হয় আর কিছু বাস্তবায়িত হয় না। কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক যদি তা পরিলক্ষিত হয় তবে মানুষেরা তাকে সম্মান করে আর যদি বাস্তবায়িত না হয় তখন তার সম্পর্কে কিছুই বলে না। আসলে ব্যাপারটা কিছুটা ঝড়ে বক মরে ফকিরের ফকিরালী বাড়ে এর মত।
আল্ কুরআনের অদৃশ্যের খবরগুলো প্রত্যেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেই। যেহেতু এটা কোন মানুষের বাণী নয় বরং এই সংবাদ গুলো আলাহর, যিনি সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা পরিচালক ও একক নিয়ন্ত্রক, তিনি এই জগতের গোপন প্রকাশ্য সবই জ্ঞাত। তিনি অবগত আছেন এই জগতে যা ঘটেছে এবং ঘটবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবই তার জানা।
অতএব এখন আমরা আল কুরআনের কিছু অদৃশ্যের খবর নিয়ে আলোচনা করব যে খবর কোন মানুষের পক্ষ থেকে হওয়া অসম্ভব।
আলাহর রাসূল (স.) তার দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন পৃথিবীর সবাই তার বিরোধিতা করতে ছিল যেমন মক্কার মোশরেক বা মদিনার ইহুদীরা শামের খৃষ্টানরা এমন ভাবে চতুর্দিক থেকে সবাই দুর্বল মুসলিমদের কষ্ট দিচ্ছিল, হিংসা জন্ম নিচ্ছিল, ষড়যন্ত্র চলছিল এই দাওয়াতকে চিরতরে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দেয়ার। এমতাবস্থায় আলাহর আয়াত অবতীর্ণ হলো:

أم يقولون نحن جميع منتصر , سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر (سورة القمر ٤٤-٤٦)

এরা কি বলে ঃ আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল। এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।
(সূরা কামার ৪৪-৪৬)

পৃথিবীর কোন জ্ঞানী লোক যদি এই খবর শুনতো যে, মক্কার এই দুর্বল লোকেরা কুরাইশদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী হবে তবে অবশ্যই হতভম্ব ও আশ্চর্য হতো যে কীভাবে এই সেই দুর্বল জাতি যাদের কোন সমরশক্তি নেই, অর্থ নেই, না আছে কোন জনশক্তি। সেই সময় এই খবরকে হয় তো কেউ মোহাম্মদ (স.) এর খেয়াল, ধারণা ও স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে তা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেছে এবং বাস্তবতার সাথে প্রত্যক্ষ করেছে এবং বলতে বাধ্য হয়েছে এমন খবর কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বরং তা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তা আলাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নবী (সা.) কে শত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিলেনঃ

يايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك , وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس (سورة المائدة . ٦٧)

হে রাসূল যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। তুমি সব কিছুই পৌঁছে দাও আর যদি এরূপ না কর তাহলে তুমি আলাহর পয়গাম পৌঁছে দাও নাই। আলাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদা ৬৭)

আলাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় নবীকে সকল শত্রুর হাত থেকে রক্ষার ঘোষণা এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার কারণ শত্রুরা শক্তিশালী হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ মু'মেন রা অল্প ও দুর্বল, এমতাবস্থায় তার নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল আরো অধিক। অথচ আলাহর রাসূল তার সাহাবাগনকে ওহির কথা জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা যারা নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত তোমরা চলে যাও। আলাহ নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং নিজেই তাকে সকল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বহু সীমালংঘনকারী তাদের সৈন্য সামন্ত দিয়ে সব ধরনের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ সতর্ক ও সাবধান থাকা স্বত্ত্বেও তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

অথচ শত্রুদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (স.) কে হত্যার ঘোষণা ও হুমকি থাকা স্বত্ত্বেও তার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি বললেন ঃ

''أيها الناس .. انصرفوا .. فقد عصمني الله ،،(الدر المنثور ٢/ ٢٩٩)

হে মানুষেরা তোমরা চলে যাও, আলাহ আমাকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। (আদ্দুর রুল মানছুর ২/২৯৯)

তাই তিনি একা চলতেন তার সাথে কোন রক্ষী ছিল না। তার শেষ জীবন পর্যন্ত এমন ভাবেই কাটিয়ে দিয়েছেন।

রাসূলুলাহ (স.) যখন হিজরত করতে ছিলেন তখন মুশরেকরা তাকে হত্যার প্রচেষ্টা করেছিল। অথচ রাসূল (স.) এর কোন বডিগার্ড ছিল না। তিনি তাদের লাইনেই ভিতর দিয়ে, তাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসলেন। গারে ছাউরে অবস্থানের পর মদিনার দিকে রওয়ানার পথে সুরাকা বিন মালেক রাসূল (স.) কে হত্যার উদ্দেশ্য নিকটবর্তী হলো। তার শেষ ফল এই ছিল যে, যখন সে রাসূল (সা.) এর হেফাজতের ব্যাপারে আলাহর নিদর্শন দেখার পর উল্টো তাঁর থেকে নিজের নিরাপত্তার আবেদন করেছিল।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত, একদা রাসূল (সা.) একটি গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন। তাঁর তলোয়ারটি উক্ত গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে উক্ত তলোয়ারটি নিয়ে উন্মুক্ত করে রাসূল (সা.) কে বলল, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন না? তিনি বললেন না। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন আলাহ আমাকে তোমার থেকে রক্ষা করবেন। অতএব তলোয়ারটি রেখে দাও। উক্ত মুশরেকটি তলোয়ারটি রেখে দিল। উক্ত মুশরেকটির তলোয়ারটি রেখে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

অতএব এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান যে, আল্ কুরআনে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তা কোন মানুষের পক্ষ থেকে নয় বরং মহান করুণাময় আলাহর পক্ষ থেকে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ডা. শাহ মোহাম্মদ হেমায়েত উলাহ স্বীয় কিতাবে সূরা লাহাব উলেখ করে বলেন ঃ এই সুরার ভবিষ্যৎ বাণী হচ্ছে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী দোযখের আগুনে জ্বলবে। কারণ তারা ঈমান না নিয়ে মারা যাবে আর লাহাব ছিল মুহাম্মাদ (সা.) এর চাচা। যখনই কেউ মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট থেকে ফিরে আসত তখনই আবু লাহাব তার কাছ থেকে মুহাম্মাদ (স.) কি বলেছেন তা জেনে নিত এবং মুহাম্মাদ (সা.) যা বলতেন ঠিক তার উল্টোটা করত। উপরোক্ত সুরা নাজিল হয়েছে আবু লাহাবের মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে। কাজেই আবু লাহাব কুরআন মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যদি একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শুধু বলত যে, আমি ঈমান এনেছি। দেখ কুরআন মিথ্যা দাবি করেছে। তার পক্ষে কুরআন মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য একথা বলা কত সহজ ছিল। কিন্তু যেহেতু এটা মহান স্রষ্টারই বাণী যিনি ভবিষ্যৎ জান্তা অতএব আবু লাহাব উক্ত অভিনয়টুকুও যে করবে তা মহান স্রষ্টা ভালভাবেই জানতেন।

মহা গ্রন্থ আল্ কুরআন স্বয়ং আলাহর বাণী যা আজও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত অবস্থায় থাকবে যেহেতু আলাহ তা আলা স্বয়ং তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

إنا نحن نزلنا الذكر ,وإناله لحافظون

আমি এই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণ কারী।

আল্ কুরআনে এমন ভাবে অনেক অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংবাদ রয়েছে যার অধিকাংশ সে সময় ছিল অজানা। বর্তমানে বিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কুরআনের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আল্ কুরআনের অলৌকিকতায় মুশরেকদের স্বীকৃতি :

বিশ্বের কাফের মুশরেক, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম অমুসলিম, আরব অনারব, অতীতে ও বর্তমানে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, আল্ কুরআন কোন মানুষের তৈরি নয় বরং মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আলাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

এই হচ্ছে ওয়ালেদ ইবনে মুগীরা। সে ছিল মুশরেকদের সর্দার। সে রাসূল (সা.) এর কাছে আসল। তিনি কুরআন পড়তে ছিলেন। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এই তিলাওয়াত শুনে একে আলাহর বাণী মেনে নিয়ে মুশরেকদের সবার সামনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আবু জেহেল এই খবর শুনে তার কাছে এসে বলল ঃ হে চাচা! তোমার সম্প্রদায় তোমার জন্য সম্পদ জমা করেছে। সে বলল কেন? আবু জেহেল বলল: তোমাকে দেয়ার জন্য। যেহেতু তুমি মোহাম্মদ (সা.) এর কাছে তার বিরোধিতা করার জন্য গিয়েছ। ওয়ালেদ বলল: কুরাইশরা জানে যে আমি তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সম্পদশালী। আবু জেহেল বলল: তাহলে তুমি এমন কথা বল যাতে তোমার সম্প্রদায় বুঝতে পারে যে, তুমি মোহাম্মদ (সা.) কে ঘৃণা ও অস্বীকার করছ। সে বলল: আমি কি বলব তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমার চেয়ে বেশী কবিতা জানে। আল-াহর শপথ আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জ্বিনের কালাম হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফলগুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার ঊর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম না। ওয়ালীদ সত্য বলেছে।

কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রাবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল, অপর দিকে রাসূলুলাহ (সা.) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও তবে আমি মুহাম্মাদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে তবে আমরা যেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা যখন হজরত হামজা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওত্বার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল হে আবুল ওলীদ (ওত্বার ডাকনাম) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুলাহ (সা.) এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানিত। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে যা সমস্ত মুশরেকরা উপলব্ধি করেছে। শুধু তাই না বরং ওয়ালীদ যেভাবে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে তদ্রুপ সবাই আল্ কুরআনের অলৌকিকতা গভীর ভাবে অনুভব করেছে। এই সত্যকে স্বীকার করতে তাদের অহংকার, কুফরী ও ধোঁকা তাদেরকে বারণ করতে পারেনি। কারণ অস্বীকার করার কোনই উপায় ছিল না। এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি। যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুলাহ (সা.) বললেন আবুল ওলীদ বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বললঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন সম্পদ অর্জন করা হয় তবে আমরা ওয়াদা করছি আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সে বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসন ক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয় তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জ্বীন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব সে

আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয় ভার আমরাই বহন করব। কেননা আমরা জানি, মাঝে মাঝে জ্বীন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।
ওত্বার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রাসূলুলাহ (সা.) বললেন ঃ আবুল ওলীদ আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন: এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব। রাসূলুলাহ (সা.) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা ফুস্‌সিলাত তেলাওয়াত করতে শুরু করে ওতবা চুপ চাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রাসূলুলাহ (সা.) সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন এবং ওত্বাকে বললেন, আবুল ওলীদ আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দুর থেকে ওত্বাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আলাহর কসম আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌঁছালে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন? ওতবা বলল আলাহর কসম আমি এমন কালাম শুনেছি যা জীবনে কখনও শুনিনি। আলাহর কসম সেটা জাদু নয়, কবিতা নয়, এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্প্রদায় তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবিলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস। এবং তাঁকে তার কাজ করতে দাও। কেননা তার এই কালামের এক বিশেষত্ব রয়েছে।
কুরাইশদের বড় বড় নেতা ও সরদারদের সামনে এই ছিল ওত্বার আল্ কুরআনের অলৌকিকতার স্বীকারোক্তি এবং আল্‌কুরআনের সামনে এই ছিল ওত্বার আল কুরআনের প্রভাবে তার হৃদয় মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন।

অন্তরসমূহে আল-কুরআনের প্রভাব :

আলাহর বাণী আল-কুরআন পৃথিবীর বুকে এক অলৌকিক গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম অমুসলিম কাফের মুশরিক সবার হৃদয়ে এর প্রভাব বিস্তৃত। এমনকি মক্কার মুশরিকরাও এই কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই কুরআন তাদের অন্তরসমূহকে বিজয় করে নিয়েছে, তাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই তারা মানুষের অগোচরে গভীর রাতের অন্ধকারে গোপনে তা শ্রবণ করার জন্য ব্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, ওতবা ইবনে রাবিয়া এবং অলিদ ইবনে মুগিরা বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। তারা তাদের অনুসারীদেরকে এই কুরআন না শোনার উপদেশ দিত। আলাহ তাআলা তাদের কথাগুলো এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. (سورة فصلت ٢٦)

কাফিররা বলে: তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা ফুস্‌সিলাত- ২৬)
উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কার বুকে মুসলমানদেরকে বেশী কষ্ট দিতেন এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন। একদা তিনি তলোয়ার উঁচু করে মোহাম্মদ সা. কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে নোয়াইম বিন আব্দুলাহর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তা গোপন করে উমরকে জিজ্ঞেস করলেন। হে উমর তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন: আমি মোহাম্মদ সা. কে হত্যা করার জন্য যাচ্ছি। তিনি কুরাইশদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছেন, তাদের ধর্মের কুৎসা রটনা করছেন, ও তাদের দেবদেবীদেরকে গালিগালাজ করছেন। নোয়াইম তাকে বললেন: তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও এবং প্রথমে তোমার বাড়ি সামলাও। তিনি বললেন: কেন, কি হয়েছে? তিনি বললেন: তোমার চাচাতো ভাই সাঈদ ইবনে যায়েদ ও তোমার বোন ফাতেমা বিন্‌তে খাওাব সহ তোমার ভগ্নীপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর তিনি তার বোনের বাড়িতে গেলেন। তখন খাব্বাব ইবনে আরত রা. ফাতেমা ও তার স্বামীকে সূরা ত্বহা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের শব্দ পেয়ে খাব্বাব রা. আত্মগোপন করলেন। উমর ঘরে প্রবেশ করে বললেন: আমি কীসের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারা বললেন: না কিছু না। তিনি বললেন: আমি খবর পেলাম তোমরা নাকি মুহাম্মদের দ্বীনের অনুসরণ করেছ? তারপর তিনি তার ভগ্নীপতির গলা চেপে ধরলেন। ফাতেমা তার স্বামীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলে তার মাথায় এমন আঘাত করলেন তাতে জখম হয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। অতপর তারা দু'জনেই তাকে বললেন: হ্যাঁ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আলাহ ও তার রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান এনেছি। তুমি এখন যা ইচ্ছা করতে পার। উমর তার বোনের চেহারায় রক্ত দেখে লজ্জিত হয়ে তার বোনকে বললেন: আমি তোমাদেরকে যে ছহিফা পড়তে শুনেছি তা আমাকে দাও। আমি দেখি মুহম্মদ কি নিয়ে এসেছে। আমি কসম করে বলছি, সেগুলো

আমি ছহি সালামতে ফেরত দিব। তখন তার বোন তাকে গোসল করে আসতে বললেন এবং তিনি তা-ই করলেন। অতঃপর ছহিফা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى (سورة طه١-٤)

ত্বহা ! তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশার্থে। যিনি সমুচ্চ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এটা তার নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা-ত্বহা-৪-১)

অতঃপর উমর বললেন কত সুন্দর এই বাণী। মুহম্মদ কোথায়? আমাকে দেখিয়ে দাও আমি তার কাছে যাব এবং ইসলাম গ্রহণ করব।

জাবের ইবনে মুতয়িম বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. কে মাগরিবের নামাজে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। যখন তিনি পড়তে ছিলেন:

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون (سورة الطور. ٣٥-٣٧)

তারা কোন কিছু ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী, তোমার রবের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? সূরা তুর ৩৫-৩৭।

(তিনি বললেন) তখন আমার হৃদয় যেন ইসলামের জন্য উড়ে গেল। আমার অন্তরে ঈমান স্থাপন হলো।

এমনিভাবে নবী করীম সা. হজের মৌসুমে মদীনা থেকে আগত লোকদের মধ্যে যাকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন, সাথে সাথে তিনি ঈমান এনেছেন। মদীনার আনসারদের এমন কোন ঘর ছিল না, যাতে কুরআন ছিল না। সবার মাঝে এমন কথা সুপ্রসিদ্ধ যে, মদীনা একমাত্র কুরআন দিয়ে বিজয় হয়েছে।

শুধু তাই নয় বরং পবিত্র কুরআন প্রতিষ্ঠা মুমেনের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে। তা শ্রবণে শান্তি পায়, অন্তর প্রফুল হয়। হৃদয়ে আরাম বোধ করে। আলাহ তাআলা বলেন:

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. (سورة الزمر ٢٣)

আলাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সংবলিত কিতাব, যা সু সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃপুন আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয় অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আলাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আলাহর পথ নির্দেশ তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আলাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার - ২৩)।

আলাহ তাআলা আরও বলেন ঃ

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين (سورة المائدة /٨٣)

আর যখন রাসূলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে এই কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে হে আমাদের রব আমরা মোমিন হলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐ সব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন যারা (মুহম্মদ ও কুরআনকে সত্য বলে) স্বীকার করে। (সূরা মায়েদা ৮৩)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে:

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (سورة الأنفال)

কেবলমাত্র মোমিন তারা, যখন তাদের সামনে আলাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। (সূরা, আনফাল- ২)

দুনিয়াতে আমাদের অবস্থান :

আমরা যদি আমাদের বয়সের যা অতীত হয়েছে তা নিয়ে একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা আমাদের জীবনের মূল্য বুঝতে পারব। কেননা আমরা তো এখন কবরের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছি। আমাদের হায়াতকে যদি স্মরণ করি যা শেষ হয়েছে সে মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা এই দুনিয়াতে মুসাফির ছাড়া আর কিছুই নই। যেমন খবর দিয়েছেন আমাদের নবী মুহম্মদ সা.। তিনি বলেন ঃ

‘‘عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ،،

তুমি পৃথিবীতে এমন ভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, অথবা মুসাফির ।
অতএব আমাদের চিন্তা করা উচিত আমরা মুসাফির হিসেবে আমাদের স্থায়ী ঠিকানার জন্য কি প্রস্তুত করেছি? অথবা আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত রয়েছি? কাল কিয়ামতে যা কিছু আমাদের প্রয়োজন তা থেকে অমনোযোগী রয়েছি । অথচ অনতিবিলম্বে আমরা সব কিছু রেখে বিদায় নিব । এক টুকরা জমির জন্য কত ঝগড়া বিবাদ করছি, মারামারি করছি । কেউ দাবি করছি এটির মালিক আমি, আবার অন্যেরা দাবি করছে এটা আমার । এই জমির প্রকৃত মালিক কে?
আলাহ তাআলা বলেন ঃ

وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين .وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.(سورة الحجر. ٢٣-٢٥)

আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী । তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি । তোমার রবই তাদেরকে সমবেত করবে, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ । (সূরা হিজর ২৩-২৫)
এই পৃথিবী পরীক্ষাগার । এখানে বাছাই হচ্ছে কে আলাহর আনুগত্য করছে এবং কে আলাহর নাফরমানি করছি । অতঃপর এই পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় বেরিয়ে আসবে যে অবস্থায় এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল ।
আলাহ তাআলা বলেন ঃ

ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.(سورة الأنعام ٩٤)

আর তোমরা আমার কাছে একা এসেছ যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম । আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পিছন ছেড়ে এসেছ । (সূরা আল আনআম ৯৪)
পৃথিবীর দিনগুলো শেষ হচ্ছে কিন্তু আখেরাতের জীবন হচ্ছে অবশিষ্ট ও চিরন্তন । পৃথিবীটা সুখ দুঃখ মিশ্রিত আর আখেরাতটা এককভাবে সুখ ও নিয়ামতে ভরপুর ।
আলাহ তাআলা বলেন,

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد (.سورة ق ٣١-٣٥)

জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য উপস্থিত করা হবে আর তা অতি নিকটে । এই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক আলাহর অনুরাগী হিফাযতকারীর জন্য । যারা না দেখে দয়াময় আলাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় । তাদেরকে বলা হবে, এটি শান্তির স্থান, তোমরা তাতে প্রবেশ কর, এটা অনন্ত জীবনের দিন । সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকটে রয়েছে তারও অধিক । (সুরা ক্বাফ ৩১-৩৫)
কিন্তু যারা আলাহকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি এবং তারা আলাহর সম্মুখে যখন দাঁড়িয়ে যাবে তখন তারা পৃথিবীতে আর একবার ফিরে আসার আবেদন করবে, যাতে তারা যা করেছে তা বাদ দিয়ে সৎ আমল করতে পারে । অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ দেয়া হয়েছিল, এবং তাদের কাছে সতর্ককারী এসে সতর্ক করে দিয়েছে এবং ঐ দিবস সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছে যে দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না । আলাহ তাআলা বলেন ঃ

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير (سورة فاطر ٣٦-٣٧)

যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন । তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না । এমন ভাবে আমি প্রত্যেক কাফেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি । সেথায় তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রব আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কর্ম করব । পূর্বে যা করতাম তা করব না । আলাহ বলবেন: আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীরাও এসেছিল সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই । (সূরা ফিতার ৩৬-৩৭)
বর্তমান বিশ্বে মানুষের জিন্দিগির দিকে লক্ষ্য করি । তা নিয়ে, চিন্তা ভাবনা করি তাহলে দেখতে পাই তারা অশান্তির আগুনে জ্বলছে, অস্থিরতায় ভুগছে, সন্ত্রাসের আতঙ্ককে দিন কাটাচ্ছে, কোথাও নিরাপত্তা নেই, তাই

সুখ ও শান্তি বলতে কিছুই নেই তাদের জীবনে, না আছে পরিবারে, না আছে সমাজে, না আছে দেশে, পূরো বিশ্বের যেন একই অবস্থা ।

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে গিয়েছে। মানুষ যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তার প্রতিপালকের জ্ঞান, শক্তি, কুদরত সম্পর্কে জ্ঞাত হতো, মৃত্যুর পর তার সাক্ষাতের বিশ্বাসী হতো, পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারতো, কোন কাজে তাদের সৃষ্টিকর্তা রাজি ও খুশি আছেন তা যদি জানতে পারতো ও মৃত্যুর পর কোন জিনিস তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তা যদি অবগত হতো তাহলে তাদের এমন করুন পরিস্থিতি হতো না ।

আলাহ তাআলা বলেন ঃ

يأيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي.

হে, প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো, সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে, অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর (সূরা ফজর ২৭-৩০)

প্রতিটি মানুষের মাঝে এমন আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন যার চাহিদা দুনিয়াতে পূরণ হতে পারে না। যদি কোন মানুষকে বলা হয় তোমাকে আমরা পৃথিবীর অর্ধেকের মালিক বানিয়ে দিলাম। সে অবশ্যই বলবে আমি বাকি অর্ধেকও চাই ।

আলাহকে যারা বিশ্বাস করে না তারা ধারণা করে যে, এই দুনিয়ায় তাদের সব কিছু। দুনিয়া তাদের একমাত্র আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের স্থান। আর দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা তাদের চাহিদা পূরণ হওয়ার নয় । কীভাবে সম্ভব? এই পৃথিবীতে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের বাস। প্রত্যেকেই চায় তার মত একাই পৃথিবীর মালিক হতে। আর এখান থেকেই শুরু হয় ফেৎনা, ফাসাদ, অশান্তি ও অস্থিরতা একই পরিবারে দুই ভাইয়ের মাঝে, দুই দলের মাঝে, দুই বংশের মাঝে, দুই দেশের মাঝে। এমনটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে সারা বিশ্বে ।

আর যারা আলাহর বিশ্বাসী হবে, তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছ যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা মোমিনদের জন্য এমন জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছেন যেথায় মনের সকল চাহিদা পূরণ হবে। আলাহ তাআলা বলেন ঃ

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ,ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون (سورة الزخرف ٦٩-٧١)

যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছ এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিনিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেথায় রয়েছে সব কিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা যুখরূফ ৬৯-৭১)

মোমিন ভাল করে অবগত আছে যে, এই পৃথিবীর বুকে আলাহর হুকুমের অনুসরণে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি ও জান্নাতের স্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে না। মু'মিন আরও জানে যে, তার প্রতিপালক হালাল পন্থায় দুনিয়ায় অংশ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোন ধোঁকা ও প্রতারণা থাকবে না। থাকবে না কোন জুলুম ও নির্যাতন।

কে তোমাকে দুনিয়ায় এনেছে?

হে জ্ঞানবান! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের ফায়ছালা কি? যে ব্যক্তি তার নিজেকে এক অজানা অপরিচিত এক শহরে তার ইচ্ছা ও পছন্দ ছাড়া উপস্থিত পেয়েছে, অতঃপর সে জানতে পেরেছে যে কে তাকে সেখানে নিয়ে এসেছে? এবং তিনি তাকে সেই শহরে নিয়ে এসেছে তার পক্ষথেকে তার পথ প্রদর্শনের জন্য সংবাদ বাহক এসেছে। অতপর যারা তাকে বাঁচাতে ও পথ দেখাতে এসেছে তাদের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাদের বিরোধিতা করছে অথচ তারা তার কষ্টকে বরণ করে নিচ্ছে। যে তাদেরকে মন্দ বলছে অথচ তারা তার নিকটে যাচ্ছে?

জ্ঞানী লোক অবশ্যই বলবে যে, ঐ ব্যক্তির সর্ব প্রথম অবশ্য করণীয় কাজ হবে, যে তাকে তার ইচ্ছা ও আগ্রহ ছাড়াই এই অপরিচিত বিশ্বে নিয়ে এসেছে তার পরিচয় নেয়া এবং তাকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। তার পথ প্রদর্শনের জন্য যদি তার পক্ষ থেকে কেহ এসে থাকেন তার সত্যতা যাচাই করা। যদি তাদের ব্যাপারে দৃঢ়তায় পৌঁছে যায় তবে তাদের সম্মান করা এবং অনুসরণ করা ।

আর যদি সে তার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয় এবং কে তাকে নিয়ে এসেছে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং তার সংবাদ বাহকের প্রতি অমনোযোগী হয়, তবে কোন সন্দেহ নেই যে, সে বোকামির ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে রয়েছে। তাই মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে, সে তো মাটি ছিল, কীভাবে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। আলাহ তাআলা বলেন ঃ

ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون (سورة الروم ٢٠)

তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। (সূরা রুম-২০)
মানুষ ও মাটির মধ্যে কত পার্থক্য? মাটির জীবন নেই, শুনতে পায় না, দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না, জ্ঞান নেই, চলতে পারে না, বড় হয় না ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। এমন কি জীবের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার কোনটাই তার মধ্যে নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি যদি তার স্থানান্তরিত হওয়ার কথা চিন্তা করে যে কীভাবে মাটি থেকে খাদ্য এবং খাদ্য থেকে বীর্য এবং তা থেকে রক্তপিণ্ড এবং তা থেকে মাংস পিণ্ড অতপর হাড় তারপর হাড়ে আবার মাংস পড়ান। তারপর কি ভাবে তার মধ্যে জীবন ও রূহ সঞ্চারিত হলো এবং কীভাবে শিশুরূপে বের হয় আসল এবং তার পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত হলো।
যদি এর সব নিয়ে গবেষণা করে তবে সে দেখতে পাবে যে এতো কিছু কোনটাই তার ইচ্ছায় হয়নি।
অতএব সর্ব প্রথম মানুষের জন্য ওয়াজিব হলো তাঁর পরিচয় নেয়া, যার হাতে তার অস্তিত্বের চাবি কাঠি, তার জীবন, গঠন ও প্রতিপালন।
আলাহ তাআলা বলেন ঃ

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. (سورة الانفطار ٦-٨)

হে মানুষ। কীসে তোমাকে তোমার মহান রব (আলাহ) হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর সুবিন্যস্ত করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন (সূরা ইনফিতার ৬-৮)
মানুষ যখনই আলাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের রাসূলগণের নির্দেশ ভুলে গিয়েছে, তখনই তারা আলাহর জন্য একটা প্রতীক বেছে নিয়েছে এবং তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, এতে মানুষের বিশেষত্ব রয়েছে তারপর তাকে সম্মান করা শুরু করেছে। আর যতই দিন অতিবাহিত হয় তাদের সম্মান আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সীমা লঙ্ঘন করতে শুরু করে। পরিশেষে ইবাদত ও সম্মানের মাধ্যমে আলাহর সাথে শরীক বানিয়ে নেয়। যেমন আরবের মোশরেকদের মূর্তি সম্পর্কে তাদের কথা আলাহ তা'আলা বর্ণনা করেন:

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى(سورة الزمر ٣)

আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদের আলাহর সান্নিধ্য এনে দিবে। (সূরা যুমার- ৩)
মানুষের অজ্ঞতার কারণে সেই যুগে মূর্তি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পাথর, গরু, ইত্যাদির পূজা করা হতো। বর্তমানে এগুলোর সমষ্টি নেচার বা প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে। যারা নেচার বা প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বুঝাতে চায় তারা যুক্তি পেশ করে যে, গরুর গোবরে অটোমেটিক পোকা সৃষ্টি হচ্ছে, খাদ্যে ক্ষুদ্র জীবাণু জন্ম নিচ্ছে ও খাদ্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই দেখ, প্রকৃতির থেকে এমনিতেই জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের এই যুক্তিকে ভ্রান্ত ও ভুল প্রমাণ করেছেন ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃতিতে নিজে নিজেই কোন কিছুর জন্ম হয়নি। বরং সেখানে পূর্বে থেকেই ক্ষুদ্র জীবাণু রয়েছে যা খালি চোখে দেখা সম্ভব হয়নি। তিনি তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে বিজ্ঞানীদের বিশ্বস্ত করেছেন। তিনি কিছু খাদ্য নিয়ে বাতাস থেকে আলাদা করেছেন। তারপর উত্তাপের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জীবাণু গুলো ধ্বংস করেছেন। অতঃপর তা কৌটার মধ্যে বন্ধ করে রেখেছেন। তারপর দেখা গেছে যে, তাতে আর নতুন জীবাণু জন্ম নিতে পারেনি ফলে খাদ্য নষ্ট-হয়নি। যার কিছুই নেই সে অপরকে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক নয়, তার থেকে কোন মানুষ সম্পদ চায় না। জাহিল ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম বের হয় না। কেননা যার সে অধিকারী নয় তা সে দিতে পারে না।
গবেষণার মাধ্যমে আমরা যদি সৃষ্টির নিদর্শন অবলোকন করি যা আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় জানিয়ে দেয়।
আর যারা ধারণা করে যে, প্রকৃতি তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তারা প্রকৃত পক্ষে আকলের খিলাফ করেছে, সত্যের বিরোধিতা করেছে। কেননা এই বিশ্ব জগৎ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী, পথ প্রদর্শক, রিজিক দাতা, সংরক্ষণ কারী, দয়াময় এক ও অদ্বিতীয়।
আর প্রকৃতি যার কোন ইল্‌ম নেই, জীবন নেই, অভিজ্ঞতা নেই, দয়া নেই, করুণা নেই, ইচ্ছা নেই, অনুভূতি নেই, তারপরও মূর্খরা কীভাবে এমন ধারণা করতে পারে?
প্রকৃতি হচ্ছে ঐ সব সৃষ্টিকুল যাকে এক একটি বৈশিষ্ট্যের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মূর্তি পূজারিরা এই প্রকৃতির অংশ বিশেষ পূজা করে। কেউ করে সূর্যের পূজা, কেউ করে চন্দ্রের পূজা, এমন ভাবে গ্রহ, নক্ষত্র, আগুন, পাথর ও মানুষের পূজা করছে। আর এই সব মিলেই হচ্ছে প্রকৃতি। বর্তমানে এই প্রকৃতি পূজারিরা ধারণা করছে যে, এই প্রকৃতি তাদেরকে সৃষ্টি করেছে। অথচ এই প্রকৃতির কোন জ্ঞান নেই বরং মানুষের জ্ঞান রয়েছে। প্রকৃতির কোন বুদ্ধি নেই বরং তাদেরই রয়েছে বুদ্ধি। প্রকৃতির কোন অভিজ্ঞতা নেই বরং তাদের

রয়েছে অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির কোন ইচ্ছা নেই বরং তাদের রয়েছে ইচ্ছা। তারা কি জানে না সে যে জিনিসের অধিকারী নয়, তা সে দিতে পারে না।
আলাহ তাআলা বলেন ঃ

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز(سورة الحج ٧٣-٧٤)

হে লোক সকল একটি উপমা দেয়া হচ্ছে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর, তোমরা আলাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও পারবে না। এমন কি মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে এটাও তারা ওর নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই না দুর্বল। তারা আলাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না। আলাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা হজ ৭৩,৭৪)
আর যদি কোন মানুষকে হত্যা করা অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া যায়। তাহলে সেই
রাস্তার পার্শ্বের কোন পাথরকে অপবাদ দেয় না, যে পাথরটি মানুষটিকে হত্যা করেছে কেননা পাথরটির এমন কাজ করার কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

যার অস্তিত্ব নেই সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না :

আমরা যদি সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করি যা মানুষের মধ্যে জীব জন্তু ও গাছ পালার মধ্যে দৈনন্দিন জন্ম নিচ্ছে। আমরা যদি ভাবনা করি এই অস্তিত্বে যা কিছু ঘটছে দিন রাত, আলো বাতাস ও বৃষ্টি ইত্যাদি। যদি আমরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির সূক্ষ্ম নিয়ম নীতি সম্পর্কে গবেষণা করি তবে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত আঁকল বুঝতে পার যে এগুলো কোন অস্তিত্ববিহীনের সৃষ্টি হতে পারে না বরং এ সব সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, যিনি আছেন। আলাহ তা'আলা বলেন:

"العدم يخلق شيئا "

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون (. سورة الطور ٣٥-٣٦)

তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। (সূরা তুর ৩৫-৩৬)

সৃষ্ট বস্তুর প্রতি গবেষণা স্রষ্টার কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

নিশ্চয়ই সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায় তা এমন শক্তি, ও সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ করে যা স্রষ্টার কাছে রয়েছে। যেমন কাঠের তৈরী একটি দরজার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি যা সূক্ষ্ম ও মসৃণ ভাবে তৈরি হয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি যে তৈরিকারী কাঠের মালিক, তিনি সূক্ষ্ম নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তা কাটতে পারেন। তার কাছে কাঠ মলিন ও মসৃণ করার ক্ষমতা আছে। তিনি পেরেকের মালিক এবং দরজায় বিভিন্ন অংশগুলো পেরেক দিয়ে ঠিক করার শক্তি রয়েছে এবং দরজার তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে।
এমন ভাবেই যদি আমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি তাহলেই আমরা জানতে পারব সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دآبة آيات لقوم يوقنون, واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون, تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله و آياته يؤمنون (سورة الجاثية ٣-٦)

মু'মিনদের জন্য আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে। এবং দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে। চিন্তাশীলদের জন্য রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আলাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে

। এগুলো আলাহর আয়াত যা আমি যথাযথ ভাবে তোমার নিকট আবৃত্তি করছি সুতরাং আলাহ এবং তার আয়াতের পরিবর্তে আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করবে? (সূরা জাছিয়া ৩-৬)
ক্রিয়া কর্তার কিছু বৈশিষ্ট্যের আয়না স্বরূপ। ক্রিয়া ও কর্তার মাঝে রয়েছে শক্তিশালী সম্পর্ক। কর্তা হচ্ছে প্রথম ও ক্রিয়া হচ্ছে ফলাফল। ক্রিয়ার মধ্যে যা কিছু পাওয়া যাবে তা কর্তার কাছে রয়েছে। যেমন আমরা যদি বিদ্যুতের বাল্বের দিকে নজর দেই তবে জানতে পারি যে, এই বাল্বের তৈরিকারীর কাছে রয়েছে কাচ। নিশ্চয়ই তার কাছে উক্ত বাল্বের আকৃতি বলের মত গোলাকার করার শক্তি রয়েছে। এবং সেখানে নিপুণতার সাথে তৈয়ার করেছে।
তেমনি ভাবে আমরা যদি চলমান একটা গাড়ি কোন রাস্তায় দেখতে পাই। যেখানে থামার প্রয়োজন থেমে যাচ্ছে। আবার সেখানে ঘোরার প্রয়োজন সেখানে ঘুরছে, আবার দ্রুত চলার সময় দ্রুত চলছে, তখন আমরা বুঝতে পারছি যে গাড়ির চালকের জ্ঞান ও বুদ্ধি রয়েছে। গাড়ি চালানোর দক্ষতা রয়েছে এবং রাস্তা সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাতে চালক অবশ্যই রয়েছে। আর যদি তাতে চালক না থাকতো তবে এমন সূক্ষ্ম সুন্দর ভাবে গাড়িটি চলতো না।

প্রকৃত ঈমান :

আলাহ সুব্হানাহু তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে সেই প্রকৃত ঈমানের স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, যে ঈমানের দ্বারা আলাহ আমল সমূহ কবুল করবেন এবং যার কারণে আলাহ মু'মিন বান্দাদের দেয়া ওয়াদা সমূহ বাস্তবে পরিণত করবেন।
এ সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون .(سورة الحجرات ١٥)

তারাই মোমিন যারা আলাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আলাহর পথে ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জেহাদ করে তারাই সত্যবাদী। (সূরা হুজুরাত ১৫)
এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, সত্য ঈমান যা কবুল করা হবে তা হচ্ছে, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আলাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করার মাধ্যমে কাজে পরিণত করবে।
সেহেতু অন্তরের বিশ্বাস ঈমান কবুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ইবলিস শয়তানের বিশ্বাস আলাহর প্রতি ছিল। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

قال رب فانظرني إلي يوم يبعثون.(سورة ص ٧٩)

সে (শয়তান) বলল ঃ হে আমার প্রভু আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন। (সূরা ছাদ ৭৯)
তারপরও আলাহ তা'আলার একটি মাত্র হুকুম অমান্য করার কারণে তাকে কাফের বলে অবহিত করেছেন। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين. (سورة البقرة ٣٤)

ইবলিস ব্যতীত (সবাই সিজদা করল) সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা-৩৪)
অতএব প্রকৃত পক্ষে ঈমান হচ্ছে ঃ (১) এমন দৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোন সন্দেহের লেশ নেই। (২) আমল যা এই বিশ্বাসকে সত্যতা প্রমাণ করবে।
আমলের প্রকার ভেদ:
অন্তরের আমল ঃ যেমন আলাহকে ভয় করা, তার কাছে বিনয়ী হওয়া এবং তারই উপর ভরসা করা ইত্যাদি।
জবানের আমল ঃ যেমন আলাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা, তার পবিত্রতা বর্ণনা করা, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তার কাছে দোয়া করা ইত্যাদি।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল ঃ যেমন নামাজ, রোজা, জাকাত, আলাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি।
রাসূলুলাহ (স.) বলেন ঃ

''ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل ،،

কামনা বাসনা ও পোশাক পরিচ্ছদের নাম ঈমান নয় বরং ঈমান হচ্ছে যা অন্তরে ছাবেত হয়েছে এবং আমালে তা সত্যে প্রমাণ করেছে।

ঈমান বাড়ে কমে :

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, ঈমান একই অবস্থায় থাকে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। বরং ঈমান বাড়ে কমে। নেক আমল দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হয় এবং বাড়ে। এবং আলাহর নাফরমানির দ্বারা ঈমান দুর্বল হয় ও কমতে থাকে।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا .(سورة الأنفال ٢)

যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (সূরা আন্‌ফাল ২)
রাসূলুলাহ্ (আঃ) বলেন ঃ

"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن "

জেনাকারী যখন সে জেনা করে তখন সে মোমিন অবস্থায় জেনা করে না।

অতএব আমরা যদি আমাদের ঈমানের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে চাই তবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে,
জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাসকে দৃঢ় করা। বেশী বেশী হৃদয়ের আমল করা যেমন আলাহর সৃষ্টি জগতের নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা। বেশী বেশী জিহ্বার মাধ্যমে আলাহকে স্মরণ করা, হক কথা বলা, মানুষকে আলাহর দিকে ডাকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, ইলম শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল গুলো যথাযথ ভাবে আদায় করা।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. (سورة الكهف ٢٨-٢٩)

নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না। বল, সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। (সূরা কাহাফ ২৮, ২৯)

মু'মিনদের প্রতি আলাহর অঙ্গিকার :

মহান করুণাময় আলাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অনেক অঙ্গিকার করেছেন। দুনিয়াতে অঙ্গিকার করেছেন যেমন:
(১) মু'মিনদের শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য করবেন। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

"وكان حقا علينا نصر المؤمنين "(سورة الروم ٤٧)

মোমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব (সূরা রূম ৪৭)

এই আয়াতে আলাহ তা'আলা মোমিনদের সাহায্য করা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন।
(২) মু'মিনদের থেকে তাদের শত্রুদেরকে প্রতিহত করবেন।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

إن الله يدافع عن الذين آمنوا .(سورة الحج ٣٨)

নিশ্চয়ই আলাহ মু'মিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। (সূরা হজ ৩৮)

(৩) তাদের জিম্মাদারির দায়িত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

"الله ولي الذين آمنوا "(سورة البقرة ٢٥٧)

যারা ঈমান এনেছে তাদের ওয়ালী বা বন্ধু হচ্ছেন আলাহ। (সূরা বাকারা ২৫৭)

(৪) তাদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وإن الله لهاد الذين آمنوا إلي صراط مستقيم (سورة الحج ٥٤)

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আলাহ তা'আলা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। (সূরা হজ ৫৪)

(৫) কাফেরদেরকে মু'মিনদের উপর ক্ষমতা না দেয়া । আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا (سورة النساء ١٤١)

কখনই আলাহ কাফেরদেরকে মু'মিনদের উপর ক্ষমতা দিবেন না । (সূরা নিছা ১৪১)

(৬) তাদেরকে সুদৃঢ় করবেন এবং শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন । আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا (سورة النور ٥٥)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আলাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন । (সূরা নূর-৫৫)

(৭) পৃথিবীতে তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করবেন । আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض (سورة الأعراف ٩٦)

আর যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী পার্থিব নেয়ামত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম । (সুরা আরাফ ৯৬)

(৮) তাদেরকে ইজ্জত প্রদান করবেন । আলাহ তা'আলা বলেন:

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (سورة المنافقون ٨)

সমস্ত ইজ্জত ও সম্মান আলাহর, তাঁর রাসূলের (সা.) ও মু'মিনদের জন্য (সূরা মোনাফিক-৮)

(৯) তাদের সুন্দর জিন্দিগি দান করবেন । আলাহ বলেন:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حيواة طيبة (سورة النحل ٩٧)

যে মোমিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, নারী হোক অথবা পুরুষ হোক । আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব । (সূরা না হল ৯৭)

এগুলোর মাধ্যমে মু'মিন দুনিয়াতে সফলতা অর্জন করবে । আর এগুলো বাস্তবে পরিণত হয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষ সত্যবাদী মু'মিনগণের জন্য ।

আর পরকালের জন্য আলাহর তরফ থেকে যে অঙ্গিকার রয়েছে তা আলাহর এই বাণী যথেষ্ট । তা হচ্ছে ঃ

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم (سورة لقمان٩-٨)

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত । সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । আলাহর ওয়াদা সত্য, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । (সূরা লোকমান ৮-৯)

বর্তমান মু'মিনদের অবস্থা যদি,কেহ গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে তবে সে দেখতে পাবে যে আলাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিনদেরকে দুনিয়াতে যে সমস্ত ওয়াদা করেছেন সেগুলো তাদের জন্য বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে না । আমরা নিজেরা কখনও ভেবে দেখেছি কি, কেন আমাদের জন্য আলাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসছে না? কেন আলাহর পক্ষ থেকে আমাদের শত্রুদেরকে পরাস্ত ও প্রতিহত করা হচ্ছে না? আলাহ তা'আলা কেন আমাদের দায়িত্ব নিচ্ছেন না? কেন আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করছেন না? কেন মোমিনদের হাতে শাসন কর্তৃত্ব আসছে না? কেন আমরা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি? কেন কাফেররা মু'মিনদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে? কেন আমরা সুন্দর রিজিক পাচ্ছি না? কেন আমরা উত্তম ভাবে জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছি? মু'মিনদের কেন আজ পৃথিবীতে সম্মান ও ইজ্জত নেই? বরং তারা আজ লাঞ্ছিত হচ্ছে সর্বস্তরে, বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে, অপমানিত হচ্ছে সব স্থানে, পদদলিত হচ্ছে প্রতিটা দেশে । মু'মিনদের এই দুরবস্থা কেন? যা আলাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দুনিয়াতে ওয়াদা করেছেন তার সবটুকু অথবা অধিকাংশই অনুপস্থিত । অথচ আলাহ রাব্বুল আলামীন কখনই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না । যদি এই দুনিয়াতে আলাহর দেয়া অঙ্গিকার আমাদের জন্য বাস্তবে পরিণত না হয় তবে কি ভাবে আমরা আশা করতে পারি যে, আলাহর দেয়া আখেরাতের অঙ্গিকার আমাদের জন্য সেই সময় বাস্তবায়িত হবে? শেষ পর্যন্ত যদি আমরা আঁখিরাতে সফলতা অর্জন করতে না পারি তবে সেই সময় আফসোস ও হা-হুতাশ করে কোনই ফায়দা হবে না । সেই সময় আমরা মহা ক্ষতির মুখোমুখি হবে । যেমন ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছি এই পৃথিবীতে । সময় থাকতে আমাদেরকে চিন্তাভাবনা করতে হবে যে, আলাহর ওয়াদা গুলো বর্তমান মু'মিনদের জন্য বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ কি? এর কারণ যদি আমরা সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করি তবে বাস্তবে আমরা দেখতে পাব যে, বর্তমান মু'মিনদের ঈমান অতি দুর্বল । অথবা তারা ঈমানের বহু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে অথবা ঈমানের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে নেই তাই হীনমন্যতা, হতাশা তাদেরকে পেয়ে বসেছে ।

অতএব সময় থাকতে অবশ্যই ঈমানকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে হবে। সহীহ ঈমান, বিশুদ্ধ আমল, পূর্ণ একিন ও দৃঢ় মনোবলের ঈমান কে নবায়ন করতে হবে। ঈমানের সঠিক জ্ঞানকে মুসলিমদের মাঝে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ও দ্বীনের বিধান সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা শক্তিশালী হতে পারে।

মু'মিনদের হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য :

আবাদের উপযোগী জমিনের যেমন কিছু গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তেমনি মু'মিনদের হৃদয়েরও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন (১) সত্য গ্রহণে আগ্রহ।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب (سورة الزمر ١٧-١٨

অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, তাদেরকে আলাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন। (সূরা যুমার ১৭-১৮)
(২) সত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং ইসলামের জন্য হৃদয় প্রশস্ত হওয়া। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام (سورة الأنعام ١٢٥)

অতএব আলাহ যাকে হিদায়াত করতে চান ইসলামের জন্য তার অন্তঃ করণ উন্মুক্ত করে দেন। (সুরা আনআম ১২৫)
(৩) ঈমানের আহ্বানে সাড়া দেয়া, আলাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار (سورة آل عمران ١٩٣)

হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমার স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের রব! অতএব আমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করুণ ও আমাদের সকল দোষ ত্রুটি দূর করুণ এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুণ। (সূরা আল ইমরান ১৯৩)
(৪) কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ,إن الله عزيز حكيم (سورة التوبة ٧١)

আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজে আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে আর নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে আর আলাহ ও তার রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আলাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করেন। নিঃসন্দেহে আলাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমত ওয়ালা। (সূরা তাওবা-৭১)

আলাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষের জন্য একান্ত জরুরি :

মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তবে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, আলাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এমন কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করেছেন যার দ্বারা সে সকল দ্বীন ও দুনিয়াবী জ্ঞান শিখতে পারে। আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون (سورة النحل٧٨)

আর আলাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃ গর্ভ হতে নির্গত করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা নাহল ৭৮)
আলাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রথম ধারা হচ্ছে যে, জ্ঞান অন্বেষণের সেই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলো সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভে যথাযথ কাজে লাগান।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك (سورة محمد ١٩)

জেনে নাও, আলাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ত্রুটির জন্য। (সূরা মুহম্মদ-১৯)
মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও জ্ঞান ছাড়া সেই হেদায়াতের অনুসরণ সম্ভব নয় যার দ্বারা সে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য হাসিল করবে। এজন্য মানুষের একান্ত জরুরি কর্তব্য প্রথম আলাহর পরিচয় নেয়া। আমি যখন উম্মুল কুরা ইউনিভারসিটির মক্কা মোকাররমায় অধ্যয়ন করি তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

ছাত্রদের সাথে, পরিচয় ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি ছাত্রের ঘটনা আমি তুলে ধরছি যা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল, লোম শিহরে উঠেছিল ও নয়ন থেকে অশ্রু পড়ে ছিল। সে একজন নব মুসলিমনব মুসলিম তার নাম "আব্দুর রহমান" পূর্বে নামছিল নারায়ন তার বাসস্থান উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া। সে একজন ঠাকুর বংশের ছেলে। কীভাবে ও কি কারণে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা জানতে চাওয়ায় সে বলল ঃ

আমার গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। সেখানেই আমি লেখাপড়া করতাম। একই গ্রামের আব্দুলাহ্ নামে আমার এক বাল্য বন্ধু ছিল। এক সাথে একই ক্লাসে লেখা পড়া করতাম। সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। আমি তার বাড়িতে যেতাম। সেও আমার বাড়িতে আসতো। সুখে দুঃখে আমরা একজন আরেকজনের সব সময় খোঁজ খবর নিতাম । ক্লাস রুমে একই সাথে বসতাম।একজন অপরজনের পাশেই ছিলাম। এমনিভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হচ্ছিল। আমরা যখন ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলাম। একদিন তার মা হঠাৎ মারা গেল। তাই আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার বাড়িতে গেলাম। তার মা অত্যন্ত পর্দা মেনে চলত। জীবদ্দশায় তার বাড়িতে কতবার গিয়ে ছিলাম কিন্তু একটি বারও আমার নজরে পড়েনি। যদিও আমি ছোট ছিলাম, মনে মনে ভেবে ছিলাম, মৃত্যুর পর এবার একনজর তাকে দেখব । কিন্তু......... ।

মুর্দার খাটে করে তাকে কাফন পরায়ে এমন ভাবে তার উপর আর একটি পর্দার ব্যবস্থা করে কয়েক জনের কাঁধে করে বাড়ি থেকে বের করল। অন্য কারো অনুমান করা সম্ভব নয় যে আব্দুলাহর মা কত বড় ছিল? লম্বা ছিল, না খাটো ছিল? মোটা ছিল, না পাতলা ছিল?

সবাই তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন দোয়া পড়তে পড়তে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে। তাই আমি তাদের সাথে কবরস্থানের দিকে রওয়ানা হলাম। আর মনে ইচ্ছা ছিল যে, কবরে নামানোর সময় একটু দেখব। কিন্তু আমার মনের আকাঙ্ক্ষা আর পূরণ হলো না। কারণ তার মাকে কবরের নামানোর পূর্বেই কবরের চতুর পার্শ্বে পর্দা দিয়ে ঘিরে তার পর তাকে সসম্মানে নামানোর ব্যবস্থা করল। যখন আমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না তখন ভাবলাম এটা হয়তো তাদের ধর্মের বিধান।

যাক পরিশেষে আমার মাতাহারা বন্ধুকে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে আমার বাড়িতে ফিরে আসলাম। আলাহর কি ইচ্ছা কয়েকদিন পরেই আমার মাও ইহজগৎ পরিত্যাগ করলেন। আমার মুসলিম বন্ধুটিও এমন দুঃখের দিনে পাশে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিতে ক্রুটি করেনি। আমার মা ও উচ্চ পরিবারের মহিলা ছিলেন বিধায় তিনি তার জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষের চোখে দেখা দিত না।

হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী মাকে শ্মশানে নিয়ে চিতায় পুড়তে হবে। তাই বাড়ি থেকে বের করা হলো আর আমার মার উপরে এমন এটি পাতলা কাপড় ছিল যে, ভিতর থেকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। আমার বন্ধু আমার পাশে ছিল তাই কিছুটা সংকোচ বোধ করছিলাম। তার পর আমার আম্মাকে নিয়ে যাওয়া হলো শ্মশানে, রাখা হলো চিতায়। আগুন দেয়ার সাথে সাথে তার উপরে পাতলা আবরণটি পুড়ে গিয়ে আমার মা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলছে। আমার লজ্জায় মাথানত হয়ে আসছে। আমার বন্ধুর দিকে তাকাতে পারছি না। কিন্তু উপায় নেই, এতো আমাদের ধর্মের বিধান।

আগুন যখন ভালভাবে ধরেছে তখন দেখি আমার মা তখন বাঁকা হতে চাচ্ছে। আবার কখনো সোজা আবার কখনো দাঁড়াতে চাচ্ছে। এদিকে আসে পাশে অনেক লোক কারো হতে লাঠি ও বলম। তারা সবাই তাকে আঘাত করে সেই আগুনেই যথাযথ ভাবে পুড়তে বাধ্য করছে। কি করুন দৃশ্য! এ বেদনা দায়ক দৃশ্য আমাকে যেন হতবাক, অচেতন করে ফেলেছে।

হঠাৎ আমার সামনে ভেসে উঠল বন্ধু আব্দুলাহর মায়ের কাফন দাফনের সুন্দর দৃশ্য। কত সম্মান জনক ভাবে তাকে মাটি দেয়ার পর তার চির শান্তির জন্য সবাই দোয়া করে বিদায় নিল। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখন ও তার সম্মানের কিছু কমতি ছিল না। মৃত্যুর পরও তাকে যথাযথ সম্মানে কবর দেয়া হলো। মনে হয় পরগজতেরও তাদের সম্মান অক্ষুণ্ন থাকবে।

আমার জ্ঞান আবার ফিরে আসল। দেখছি আমার মা আগুনে জ্বলছে। কত কষ্ট, কত যাতনা ও কত বেদনা আমি পেয়েছি যা আজ বর্ণনার ভাষা নেই। আমার মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর করতেন।

আমার মা অভিজাত পরিবারে সসম্মানে জীবন যাপন করেছিলেন। হিন্দু ধর্মে হলেও আমার মা সাধারণ মানুষের সাথে দেখা দিতেন না। বাড়ির বাহিরে যেতেন না। অন্যান্য মেয়েদের মত ঘোরাফেরা করতেন না। আস্তে আস্তে কথা বলতেন। শান্ত মেজাজের ছিলেন তিনি। ঝগড়া ফাসাদকে তিনি কখনো পছন্দ করতে না। এমন সুন্দর স্বভাবের মা ছিলেন আমার। সুখ ও শান্তিতে ইজ্জতসহ বসবাস করতেন তিনি, অথচ মৃত্যুর সাথে সাথে তাকে এমন করে বেইজ্জত করা হলো। তার চেহারা অপর কেহ দেখেনি কিন্তু জীবনটা চলে যাওয়ার সাথে সাথে একী অবস্থা? তিনি কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি, এমন কি কারো সাথে ঝগড়া করেননি, গালিও দেননি। কিন্তু তার আত্মা বিদায় নেয়ার সাথে সাথে এ ভাবে মানুষ তাকে আঘাত করছে

কেন? চোখের সামনে এই যদি হয় তার অবস্থা তবে পরজগতে ? এ কঠিন অবস্থায় নানা ধরনের প্রশ্ন জাগছিল আমার হৃদয়ে। তন্মধ্যে সব চেয়ে বড় যে প্রশ্নটি আমার হৃদয়ে উদ্ভব হয়েছিল তা হলো ঃ সত্যই কি এটি বিধাতার হুকুম?

এর পর হতে আমি ধর্ম নিয়ে গভীর ভাবে গবেষণা শুরু করলাম। এক এক করে হৃদয়ের সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজতে শুরু করলাম। পরিশেষে আমি অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পেলাম। ভ্রান্ত পথ ছেড়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সঠিক পথে চলে আসলাম। বুঝতে আর দেরি হলো না যে, ইসলাম একমাত্র আলাহ্ মনোনীত ধর্ম, যাতে রয়েছে দুনিয়াতে সম্মান মৃত্যুর পর সুখ ও পরকালেও শান্তি রয়েছে তাতে। তাই পড়ে নিলাম লাই-লা-হা ইলালাহু মুহাম্মদুর রাসূলুলাহ্। এ ঘোষণা ছিল সম্পূর্ণ নিরালায়, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার সামনে। তাই আমার ইসলাম গ্রহণ আমার বাবা, ভাই,বোন কেউই জানতো না। এর পর থেকে বেশী সময় কাটতো একা একা, লোকের অগোচরে আমার রুমেই পড়ে নিতাম নামাজ সমূহ। আমার ঈমান অটল রাখার জন্য প্রার্থনা করতাম সেই মহান করুণাময় আলাহ্ তা'য়ালার কাছে। আমি গোপনে বিভিন্ন ইসলামী বই পড়তাম। যত জ্ঞান অর্জন করি ততই আমার আলাহর প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধি হয়েছিল। এমনভাবে অনেক দিন কেটে গেল। এদিকে আমার পরিবারের অনেকেই আমার প্রতি নজর রাখছে। একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করছে যে, সে এমন একা একা থাকতে প্রিয় মনে করে কেন? কেউ বিভিন্ন সন্দেহও করছে আমার ব্যাপারে। আবার কেউ কল্পনা করছে মা মারা যাওয়ার কারণেই হয়তো সে মানসিক ভাবে আঘাত পেয়েছে। তবে আমার ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দুর্গা পূজার সময়। তারা ইচ্ছা করেছিল আমাকে মণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি আলাহর উপর ভরসা করে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম। সবাই জিজ্ঞাসা করছে কেন তুমি মণ্ডপে যাবে না? কি হয়েছে? সেই মূর্তে আমার এ অনুভূতি হয়েছিল যে আমি এখন এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। এই পরীক্ষায় আমাকে অবশ্য উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই শাস্তির ভয় না করে মৃত্যুকে বাজি রেখে ঘোষণা দিলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এ খবর মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল সবার কানে। এদিকে বাবা রেগে আগুন হয়ে আসল আমার রুমে। তার এক হাতে ছিল একটি লাঠি আর অপর হাতে ছিল একটি ছুড়ি। এবার বাবা উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলছে যে, তুমি নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছ? আমি নির্ভয়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পড়েছি ''লাই-লা-হা ইলালাহ্''এবার বাবা নির্দয় হয়ে আমার উপর বেদম মার শুরু করলেন। আর মুখে বলতে ছিল ইসলাম গ্রহণের স্বাদ তোমার মিটিয়ে দিব। তার লাঠির আঘাতের বেগ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছিল, আর আমার মুখে ছিল ''লাই-লা-হা ইলালাহ্''। আঘাতের প্রচণ্ডতায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমি জানি না কতক্ষণ জ্ঞানহারা অবস্থায় ছিলাম, আর এ সময়ের মধ্যে আমার প্রতি কি নির্মম নির্যাতন চালান হয়েছে তা এক মাত্র আলাহ্ ভাল জানেন। তবে আমার চেতনা ফিরে আসার পর দেখি আমার শরীর ফেটে গিয়ে তা থেকে রক্ত ঝরছে। আশে পাশে চেয়ে দেখি আমার ভাই-ভাবীরা দাঁড়ান অবস্থায়। তারা সবাই বলছে, বাবা এবার এসে তোমাকে না কি বলি দেবে। অতএব তুমি এখন বলবে আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করব। এ ছাড়া তোমার পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। আমি নির্ভয়ে স্ব-জোরে তাদেরকে বলে দিলাম, আমি প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছি, সত্য ও সঠিক ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছি। যদি আমার দেহ থেকে শিরোচ্ছেদ হয়ে যায় তার পরও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করব না। আমি বিশ্বাস করেছি সেই মহান করুণাময় আলাহকে, যার হাতে আমার জীবন ও মরণ, যিনি পারেন বিপদ থেকে রক্ষা করতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ইজ্জত দিতে পারেন। যাকে ইচ্ছা তাকে অপমান করতে পারেন। তিনি ফকিরকে বাদশাহ করতে পারেন এবং বাদশাহকে ফকির বানাতে পারেন। তিনিই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তিনিই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বাবা আবার লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে আসল এবং নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার শুরু করল। প্রতিটা আঘাতে আমি আলাহকে স্মরণ করছি আর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে ''লাই-লা-হা ইলালাহ্''। ব্যথার উপর আঘাত কত যে কষ্ট তা হয়তো আজ মুখে বর্ণনা করার মত নয়। এখানেই শেষ নয় বরং আমার শরীরে লবণ লাগিয়েছে তারা। ব্যথা, যন্ত্রণা ও জ্বালায় আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সচেতন হয়ে দেখি, গভীর অন্ধকারে আমি মাটিতে পড়ে আছি, তারা আমার অদূরেই সবাই মিলে পরামর্শ করছে। আমি শুনতে পাচ্ছি, বাবা বলছে, না, তা হবে না। তাকে জবাই করতেই হবে। ধর্ম ত্যাগের কি অপরাধ তা যেন অন্যেরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। সময় ঠিক করল আগামী কাল প্রকাশ্যে দিবালোকে তাকে হত্যা করা হবে। তবে সমস্যা হলো বাকি রাত টুকু কীভাবে কাটবে? কেউ বলছে সে তো অজ্ঞান অসুবিধা কোথায়। অন্যজন বলছে, যদি রাত্রের মধ্যে জ্ঞান ফেরে, তারপর সে পালিয়ে যায়? কেউ প্রস্তাব দিচ্ছে যে তাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখা হোক। বাবা বললেন না, সে মুসলমান হয়েছে ধর্মত্যাগী, অপবিত্র কোন মানুষকে আমাদের কোন ঘরে রাখা

যাবে না। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে তুলসী গাছের পাশে একটি পরিত্যক্ত কূপে তাকে বাকি রাতটা রাখা হবে । জ্ঞান ফিরলেতো আর কোন অসুবিধা নেই।
সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে সেই কূপে ফেলে দেয়া হলো। আলাহর কি কুদরত আমি যেন সেই কূপে আস্তে করে বসে পড়লাম। সেখানে কোন পানি নেই, গভীরতা তেমন না। আমার শরীরের ব্যথা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করল।
অন্ধকারে কিছুই দেখতে পারছি না। একা একা উঠতে চেষ্টা করছি কিন্তু ব্যর্থ হলাম। কারণ কূপের মুখ একটি কড়াই দিয়ে ঢাকা, শুধু তাই নয় বরং সেই কড়াইয়ের উপর রয়েছে একটা ভারী পাথর। তাই নিরাশ হয়ে বসে আছি। বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছি, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর মোমিন হিসাবে আমার মৃত্যু হবে এটাই আমার আনন্দ।
হঠাৎ করে উপরে দিকে একটা শব্দ পেলাম। নজর করলাম কে যেন কড়াইটি পাথর সরিয়ে দিল। তারপর আওয়াজ ছোট করে বলছে, দাদা ! দাদা!
আমি বললাম কে?
সে বলল আমি তোমার ছোট ভাই উত্তম। তোমার হাতটি একটু উঁচু করে আমার হাত ধর। আমি তাই করলাম সে আমাকে কূপ থেকে টেনে উপরে উঠিয়ে বলল দাদা! এখন রাত তিনটা ত্রিশ মিনিট। সিদ্ধান্ত হয়েছে সকালবেলা তোমাকে বাবা প্রকাশ্যে বলী দিবে। আর এ সিদ্ধান্তের কারণে আমার ঘুম আসেনি। সবাই ঘুমিয়েছে এই সুযোগে আমি এসেছি দাদা। আমাকে ক্ষমা কর দাদা। আর কালবিলম্ব না করে তুমি এক্ষুনি চলে যাও। অনেক দূরে চলে যাবে, যাতে কেউ তোমার খোঁজ না জানে। আমি তার চেহারার দিকে লক্ষ করলাম। তার দু নয়ন থেকে অশ্রু ঝরছে আর এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। সে আমারে অত্যন্ত ভালোবাসত। সেও আমার একমাত্র প্রিয়, এবার সে আমার হাত ধরে অনুরোধ করেছে দাদা আর বিলম্ব করা কিছুতেই ঠিক হবে না। যদি কেউ টের পেয়ে বসে তবে......... ।
আমি আমার চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। ছোট ভাইটির মুখে একটি চুমু দিয়ে তার থেকে বিদায় নিয়ে আলাহর প্রশংসা করতে করতে সরে পড়লাম। রাতের অন্ধকারের এ ঘটনায় আমার ঈমান আরও কয়েক গুন বৃদ্ধি পেলো যে, রাখে আলাহ মারে কে? তাই কিছুদূর গিয়ে আলাহর কাছে সিজদায় পড়ে গেলাম। সেই প্রভুর দরবারে জানিয়ে দিলাম। হে মহান স্রষ্টা সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই, সকল ক্ষমতার মালিকও এক মাত্র তুমিই, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।
তারপর আমি আমার বাল্যবন্ধু আব্দুলাহর বাড়ি সরাসরি চলে গেলাম আলাহর কুদরতের আমি বেঁচে আছি এ খবর দিয়ে তাদের পরামর্শে অনেক দুরে এক মাদ্রাসায় গিয়ে উঠলাম। সকল চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভাল ভাবে জানার জন্য মনোনিবেশ করলাম। আমার বন্ধু আলাহ মাঝে মাঝে বিভিন্ন খবরা খবর জানিয়ে পত্র লিখত। এমন ভাবে দীর্ঘ দিন কেটে গেল। হঠাৎ একটি পত্র পেলাম, তাতে সে লিখেছে আমার বাবা ভীষণ অসুস্থ। অনেক দিন অসুস্থতার কারণে তিনি বিছানাতেই প্রস্রাব-পায়খানা করছে। বেহুঁশ অবস্থায় ঘরের মধ্যে অবস্থান করছেন। দুর্গন্ধের কারণে কোন ছেলেও তার কাছে যায় না।
এসে দেখলাম অবস্থা করুণ। ভাই ভাবীরা টেলিভিশন সহ আনন্দ উলাসে ব্যস্ত। কেউ তার খবর রাখে না। আমি নিজ হাতেই বিছান পত্র সহ সবকিছু পরিষ্কার করলাম। তার শরীর ভিজা গামছা দিয়ে মুছে দিয়ে আতর ব্যবহার করলাম। তারপর ডাক্তারকে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সহ কিছু ফল ক্রয় করে নিয়ে আসলাম।

আলাহর কি অশেষ মেহেরবানি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বাবার জ্ঞান ফিরে আসল। আমি আলাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি মাঝে মাঝে চক্ষু মেলে দেখেন। কিছু বলতে চাচ্ছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। আমাকে চিনতে পারছেন কি না আলাহই ভাল জানেন। কারণ আমার মুখে আছে দাড়ি, মাথায় আছে টুপি, পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ঔষধ সহ পথ্য সেবন যথানিয়মে চলছে। আর তাকে মাঝে মাঝে বসানোর ব্যবস্থা করতাম, হাত- পা নড়াচড়ার ব্যবস্থা করতাম। তাতে তিনি দ্রুত সুস্থ হতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ চোখ খুলে তিনি আমাকে বলছেন,
তুমি কে?
আমি আপনার মেজ ছেলে।
তুমি? তুমি না ইসলাম গ্রহণ করেছ?
হাঁ!
কি জন্য এখানে এসেছ?
আপনার খেদমত করার জন্য।

কে তোমাকে পাঠিয়েছে?
আমার সৃষ্টিকর্তা সেই মহান করুণাময় সমস্ত জগতের প্রতিপালক আলাহ আমাকে পাঠিয়েছেন।
তোমার সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন?
তুমি তো মুসলিম আর আমি তো হিন্দু?
বাবা আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম আলাহর মনোনীত ধর্ম। আমাদের ইসলাম এতো সুন্দর ধর্ম যে, যদি পিতা অন্য ধর্মাবলম্বী হয় তারপরও জীবদ্দশায় এ পৃথিবীতে তার খেদমত, তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে সেই সৃষ্টিকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সৃষ্টিকর্তা এরশাদ করছেন:

“وإن جاهداك علي أن نشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا (سورة لقمان ١٥)

তোমার মাতা পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে শরীক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। (সূরা লোকমান ১৫)

রাসূলগণের মাধ্যমে আলাহর পরিচয়:

আমরা যখন আকাশে একটি বিমান উড়তে দেখি তখন মনে করি বিমানটিতে অবশ্যই চালক রয়েছে যিনি বিমানটি সঠিক ভাবে পরিচালনা করছেন এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে এক দেশ থেকে অন্যদেশে এবং এক শহর থেকে অন্য শহরে অতি দক্ষতার সাথে উঠানামা করছেন। কিন্তু এই দর্শনের মাধ্যমে আমরা কি জানতে পারব চালকের আখলাক সম্পর্কে? দানশীল, না কৃপণ? দয়ালু না কঠিন? অহংকারী না বিনয়ী? সে কোন কোন জিনিস পছন্দ করে এবং কোন কোন জিনিস অপছন্দ করে? কোন সন্দেহ নেই যে শুধু মাত্র বিমান দর্শনের মাধ্যমে চালকের উলেখিত বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব নয়। বরং তা জানতে হলে চালকের প্রতিনিধি বা দূতের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। সাথে সাথে আরও প্রয়োজন সেই প্রতিনিধি বা দূতের সত্যতা যাচাই করা যে, সত্যিই তিনি তার প্রতিনিধি কি না? তিনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন?
আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের পূর্ণ পরিচয়ের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আলাহর বহু গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থেকে অজ্ঞ যা, জানার অন্য কোন পন্থা নেই। একটাই মাত্র পথ, আর তাহলো আলাহর রাসূলের সাথে যোগাযোগ করা যারা আলাহর পক্ষ থেকে তাদের সত্যতার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। সে সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (سورة الحديد ٢٥)

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণ সহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ-২৫)

আল্লাহ নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

“আলাহ” নামটি তাঁর জাতি বা প্রকৃত নাম। এ নামটিকে ইসমে আজম বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য নাম গুলো আলাহর ছিফাতী বা গুণবাচক নাম। এই নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শব্দটিতে যতগুলো অক্ষর রয়েছে তা যদি একটি, দুটি করে অক্ষর বাদ দেয়া হয় তার পরও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়। থেকে যদি বাদ দেয়া হয় তবে তে পরিণত হয় যার অর্থ আলাহর বা আলাহর জন্য । পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে এভাবে ব্যবহার হয়েছে। যেমন:

سبح لله ما في السموات وما في الأرض (سورة الصف ١)

আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আলাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে (সূরা ছাফ্-১)
যদি থেকে দুটি অক্ষর বাদ দেয়া হয় অর্থাৎ ও তবে তে পরিণত হয় যার অর্থ তার অথবা তার জন্য। যেমন:

له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير (سورة التغابن ١)

সার্বভৌমত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা-তাগাবুন-১)
এবার যদি শুরু থেকে তিন অক্ষর বাদ দেয়া হয় (অর্থাৎ ও দুই) বাকি থাকে তবুও তার অর্থ যথার্থ প্রকাশ পায়। তখন অর্থ হয় তার অথবা তিনি। যেমন:
তিনি আলাহ যিনি ছাড়া আর কোন সঠিক ইলাহ্ নেই। এ থেকে এটাই প্রমাণিত যে এই আলাহ শব্দটি বিশ্ব প্রভুর আসল নাম।

রাজ্জাক বা রিজিকদাতা :

মানুষ যখন রেহেমের অন্ধকারে আবদ্ধ থাকে তখন কোন মানুষ তাকে কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি। না পেরেছে তাকে কোন খাদ্য দিতে, না পেরেছে কোন পানি পৌঁছাতে। এমন কি যে মায়ের উদরে সে সৃষ্টি হচ্ছিল সেই মাও তাকে কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি বরং সেই করুণাময় রিজিকদাতা প্রতিপালক তার রিজিক সরবরাহ করেছেন তার নাভির মাধ্যমে। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার নাভি কেটে দেয়া হয়। সাথে সাথে সেই রিজিকদাতা এই সন্তানের জন্য তার মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে দেন। সেই সন্তান সেই মূর্তে বোঝে না, শুনতে পায় না, দেখতে পায় না। তাই আলাহ তাকে ইল্‌হাম করে দেন যাতে করে দুধের বোটা চুষতে থাকে অথচ সে তখনও দেখে না, শুনতে পায় না এবং বুঝতে পায় না।
তারপর সেই আলাহ তার বান্দাদেরকে তরুলতা ও গাছের মাধ্যমে রিজিক দিতে থাকেন। আর সেগুলো মাটি, পানি ও বাতাস থেকে খাদ্য তৈরি করতে থাকে। গাছ ও তরুলতার জন্য সূর্য সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ ও জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় খাদ্য পরিপূর্ণ রূপে তৈরি করতে সক্ষম হয়। তিনি যদি পরিমাণ মত মিষ্টি পানি সরবরাহ না করতেন তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ হতো না। না হতো কোন খেত খামার। তাই তিনি খেত খামারের জন্য সুন্দর উর্বর মাটির ব্যবস্থা করেছেন। সুন্দর পরিবেশ ও আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন এবং তৃণ লতা থেকে খাদ্য উৎপন্ন করার যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

فلينظر الإنسان إلي طعامه ,أنا صببنا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متعا لكم ولأنعامكم (سورة عبس ٢٤-٣٢)

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি। অতপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি এবং এতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, জয়তুন, খেজুর সহ বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল বাগান। এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলির ভোগের জন্য। (সূরা আবাসা ২৪-৩২)
যখন মানুষ অথবা পশু খাদ্য খায় আর আলাহর সৃষ্টি হজমি যন্ত্রের মাধ্যমে যখন হজম হয় তখন রিজিক দাতা, মহান করুণাময় আলাহ সেগুলো জীবনধারী শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৌঁছে দেন। চাই সেটা মগজের মাঝে হোক অথবা চামড়ার নিচে হোক অথবা হাড়ের মধ্যে হোক।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور (سورة الملك ٢١)

এমন কে আছে? যে তোমাদের রিজিক দান করবে, তিনি যদি রিজিক বন্ধ করে দেন। বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে। (সূরা মুলক ২১)
রিজিক দাতা তিনিই রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। অতপর সাগরের গভীর তলদেশে কিছু মাছের রিজিক পৌঁছে দেন, কিছু পোকার খাদ্য পৌঁছে দেন পাথরের মধ্যে, মায়ের পেটে গভীর অন্ধকারে শিশুর খাদ্য পৌঁছে দেন এবং বৃক্ষের বীজের খাদ্য বীজের মধ্যেই পৌঁছে দেন।
আলাহ তা'আলা বলেন:

وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين (سورة هود ٦)

আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিজিক আলাহর জিম্মায় না রয়েছে। আর তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমর্পিত হয়। সবই স্পষ্ট কিতাবে রয়েছে। (সূরা হুদ-৬)
আলাহ তা'আলা আর বলেন ঃ

يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني تؤفكون (سورة فاطر ٣)

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আলাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আলাহ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে? যে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে রিজিক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ? (সূরা ফিতার-৩)
জীবিকা নির্বাহ বা রিজিক জোগাড়ের বিষয়টি মানব জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বহু মুসলিম এমন রয়েছেন, যারা ইসলামী বিধি-বিধান অহরহ লঙ্ঘন করে চলছেন। কিন্তু যারা আলাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, নিশ্চয়ই আলাহ তাআলা প্রতিটি জীবের জীবিকার ব্যবস্থা করেন, তিনি সকলের রিজিকদাতা-রায্যাক, তারা কখনও রিজিক জোগাড় করতে গিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয় না। তাদের পক্ষে তা কখনো সম্ভবপর নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ঘটনা ''মুসলিম উম্মার মানসিক বিপর্যয় বইটির লেখক ড. আব্দুলাহ্ আল ফিতার উলেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

লন্ডনে এক আলজেরীয় মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে, সে তার এই ব্যক্তিগত ঘটনাটি আমাকে শোনায়। যুবকটি বলল ঃ

''একদিন আমি কাজের সন্ধানে এক হোটেলে গেলাম। হোটেল মালিক যথারীতি আমার প্রাইভেট ইন্টারভিউ গ্রহণ করল। কিন্তু তার কোন ফলাফল আমাকে জানাল না, বরং বলল ঃ এ বিষয়ে আমাদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, সেখানেই ফলাফল জানানো হবে। তোমার বিষয়টিও আমরা ভেবে দেখব!

''অতঃপর সে আমাকে মদ্য পানের আমন্ত্রণ জানাল। হোটেল মালিকের এমন আমন্ত্রণে আমি বিপাকে পড়ে গেলাম। মুসলিম হিসাবে তার এ আহ্বানের সাড়া দেয়া আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু এ মুহূর্তে সাড়া না দিলে যে রিজিকের সম্ভাব্য পথটিও বন্ধ হবার উপক্রম! এজন্য আমি সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেলাম। পরক্ষণেই এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মালিক আমাকে চাকুরির জন্য গ্রহণ করুক বা না-ই করুক, আমি তার এ আমন্ত্রণে কিছুতেই সাড়া দেব না এবং মদও পান করব না। তাই বললাম ঃ জনাব! আমি মুসলিম, আমাদের ধর্মে মদ্যপান হারাম। এজন্য আপনার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারলাম না।

এ কথা শুনে হোটেল মালিক বিস্মিত হয়ে বলল, তাই নাকি!

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তাই!

মালিক বলল ঃ তাহলে আর বিলম্ব নয়। তুমি এখন থেকেই চাকুরির জন্য নির্বাচিত।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম ঃ তা কীভাবে?

''মালিক বলল ঃ এখানে হোটেল কর্মচারীদের নিয়ে ভীষণ সমস্যা। এরা রাতভর মদের নেশায় মত্ত হয়ে আমোদ ফুর্তিতে কাটায়। তারপর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। এজন্য প্রত্যহ আসতে তাদের দেরি হয়। দেরি করা ছাড়া তারা আসতেই পারে না। তুমি যেহেতু মদ পান করো না সেহেতু তোমার ঘুমতেও দেরি হবে না, আর আসতেও বিলম্ব হবে না। কাজেই তোমার জন্য সু-সংবাদ, এ হোটেলের চাকুরি প্রার্থীদের মধ্যে তোমাকেই প্রথমে নির্বাচন করা হল।''

বস্তুত মানুষ যখন এ একিন করবে যে, রিজিক একমাত্র আলাহরই হাতে, কেউ তার রিজিক বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে না, তখন আলাহ তাআলা তার জন্য রিজিকের অসংখ্য দ্বার উন্মোচন করে দেন।

উপরোলিখিত ঘটনাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যেখানে এ যুবক ধারণাই করতে পারেনি যে, নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়ার পর এবং মদ্য পানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার পরও তাকে চাকুরির জন্য গ্রহণ করা হবে, সেখানে তাকে কতইনা সম্মানের সাথে চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

''الحكيم'' হাকীম বা প্রজ্ঞাময়

আমরা যদি সৃষ্টিকুলের আকৃতি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করি তাহলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব যে, প্রত্যেক জাতিকে মহান সৃষ্টিকর্তা স্বীয় বিজ্ঞতার সাথে এক ধরনের সৃষ্টির কাঠামো নির্ধারণ করেছেন।

মানুষের চেহারায় দুটি চক্ষু রয়েছে। তার মাঝে একটি নাক রয়েছে। দুই পার্শ্বে দুটি হাত রয়েছে। নিচের দিকে দুটি পা রয়েছে। আমরা এমন কোন মানুষ পাই না যে, তার ঘাড়ের মাঝে চক্ষু উদ্ভব হয়েছে অথবা কোন হাত তার মাথায় প্রকাশ পেয়েছে। আর এগুলো প্রমাণ করে যে,এটা প্রজ্ঞাময় আলাহর সৃষ্টি যিনি মানুষকে নিপুণতা ও বিজ্ঞতার সাথে একই ধরনের সৃষ্টির কাঠামো নির্ধারণ করেছেন। এমনই ভাবে প্রত্যেক জাতের জন্তু ও গাছ পালাকে সুকৌশলে ও বিজ্ঞতার সাথে একই আকৃতি ও একই ধরনের করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

''الحكيم''وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم (سورة العمران ٦)

তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন সেই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই। (সূরা আল-ইমরান ৬)

আমরা যদি বাতাসকে নিয়ে চিন্তা করি, যে বাতাস সব সময় শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করি, আমরা দেখতে পাব যে, বিশুদ্ধ বাতাসকে নষ্ট করে দিচ্ছি অর্থাৎ অক্সিজেনকে কার্বনডাই অক্সাইড এ পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তারপরও এই বিশুদ্ধ বাতাসের পরিমাণ কম হচ্ছে না। কেন কমতেছে না? কারণ হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা গাছপালা তরুলতা সৃষ্টি করেছেন, যারা এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে পরিবর্তন করে অক্সিজেন বানিয়ে দিচ্ছে। আর এর মাধ্যমেই বাতাসের নির্ধারিত পরিমাণ সমন্বয় সাধিত হচ্ছে নিপুণতা ও বিজ্ঞতার সাথে। এমন ভাবে আসমান ও জমিনের প্রতিটা বস্তুর মাঝে মহান প্রজ্ঞাময় আলাহর পরিচয় রয়েছে।

তিনি বলেন ঃ

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم (سورة الزخرف ٤٨)

তিনিই মা'বুদ নভোমণ্ডলে, তিনিই মাবুদ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ-৪৮)

الخبير''খাবীর বা সর্বজ্ঞ

আমরা যদি খাদ্যের দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করি, কীভাবে একই মাটি ও পানি থেকে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন প্রকার ফল বের হচ্ছে। এগুলো আমাদের কাছে এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই তা এমন সত্তার তৈরী যার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সার্বিক খবর রয়েছে। যিনি নিপুণতার সাথে একই মূল থেকে বের করেছেন। আমাদের চিন্তা আরও গভীরে নিয়ে যায় যে, একই খাদ্য থেকে আবার কীভাবে তিনি মাংস তৈরী করেছেন, রক্ত তৈরী করেছেন, হাড় তৈরী করেছেন? এমন ভাবে দুধ, চামড়া, পেশি, চুল, নখ ইত্যাদি তৈরী করেছেন?

যদি আমাদের মুখমণ্ডলের দিকে নজর করি, কি ভাবে মুখ থেকে লালা বের হয়, নাক থেকে নাকের ময়লা, চক্ষু থেকে অশ্রু, দুই কান থেকে খৈল। অথচ এ সব কিছুই এক খাদ্য থেকে।

আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াত যদি কান দিয়ে লালা নির্গত হতো, চক্ষু দিয়ে ময়লা বের হতো। এই পদ্ধতি কে ঠিক করে দিয়েছেন? এই স্থান গুলো কে নির্ণয় করেছেন? নিশ্চয় তিনিই সেই মহান করুণাময় যার সর্ব বিষয়ের খবর আছে, যিনি সর্বজ্ঞ।

،، الهادي ،، হাদী বা পথ প্রদর্শক

তুমি যদি চোখের পাতার চুলগুলোর দিকে লক্ষ্য কর তবে দেখতে পাবে যে, উপরের পাতার চুলগুলো একটু উপরের দিকে ঝুকিয়ে দেয়া রয়েছে আর নিচের পাতার চুল গুলো নিচের দিকে ঝুকিয়ে দেয়া রয়েছে। আর যদি এমনটা না হয়ে তার বিপরীত হতো তাহলে অবশ্যই দর্শনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো। আলাহ ছাড়া কে আছেন? যে, মানুষ ও জন্তুর, চোখের পাতার প্রতিটা চুলকে এমন ভাবে পথ দেখিয়েছেন?

কে তিনি যিনি নিচের মাড়ির দাঁতগুলো উপরের দিক আর উপর মাড়ির দাঁতগুলো নিচের দিক করে দিলেন? কে তিনি একই মাপের দাঁত পরস্পর বিপরীত পাশে সংযোগ করে দিলেন? কোন সন্দেহ নেই তিনি সেই আলাহ ঃ

الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي (سورة الأعلي ٣-٢)

যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুপরিমিত করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা আ'লা ২-৩)

হাঁ তিনি সেই পথ প্রদর্শনকারী যিনি মানুষ, জীব জন্তু ও গাছ পালার প্রতিটা অংগ প্রত্যঙ্গকে সঠিক স্থানে যথোপযুক্ত ভাবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংযোজন করেছেন।

আমরা যদি কোন বীজ এর দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, সেই বীজটি মাটি ভেদ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার শিকড়গুলো নিচের দিকে পাঠাচ্ছে আর কাণ্ড, ডালপালা ও পাতাগুলো উপরের দিকে পাঠাচ্ছে। কেন আমরা একটি বীজকেও পাইনি যা এই পদ্ধতির বিপরীত হয়েছে? জ্ঞানবান ব্যক্তির কাছে কি এগুলো প্রতিটা এই সাক্ষ্য বহন করে না যে, এগুলো এক অদ্বিতীয় পথ প্রদর্শকের সৃষ্টি।

،،الحافظ،، বা হেফাজতকারী

তুমি যখন মায়ের পেটে সৃষ্টি হতে ছিলে তখন তোমাকে বিপদ থেকে হেফাজত করেছেন সেই মহান করুণাময় হেফাজতকারী আলাহ। তিনি স্পর্শকাতর মস্তিষ্ককে একটি নিরাপদ প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত করেছেন এবং চক্ষুকে মাথার খাপের মধ্যে স্থান দিয়ে উপরে পর্দা দিয়ে সংরক্ষণ করেছেন এবং বুক পিঞ্জড়ার মাধ্যমে রক্ষা করেছেন হার্ট ও ফুসফুসকে। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের জীবন রক্ষা করে যাচ্ছেন সব সময় সর্বাবস্থায়। বেঁচে থাকার সব উপকরণের ও উপাদান সহজ করে দিয়েছেন। খাদ্য, পানি, আলো, বাতাস, সহ সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন।

বাতাস আমাদের শরীরে প্রবেশ করাতে অথবা বের করতে কোন কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় না। চাই লোকটি ঘুমন্ত অবস্থায় হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায় হোক। আর যদি এ ব্যাপারে আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হতো তাহলে বাতাস প্রবেশ ও বের করা ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব হতো না। আর এর মধ্যে যদি ঘুম এসে যেত তবে আমাদের থেকে বাতাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তাম।

সেই দয়াময় হেফাজতকারী পৃথিবী বেষ্টিত বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে গ্রহ, নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা ধ্বংসাত্মক উল্কাগুলো প্রতিহত করার মাধ্যমে প্রতিদিন আমাদের জীবন রক্ষা করে যাচ্ছেন। তিনি সেই আলাহ পাহাড় পর্বতের মাধ্যমে পৃথিবীকে হেলে দুলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।
আমরা কি সেই আলাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না? যিনি আমাদের ভিতর থেকে ও বাহির থেকে, আমাদের উপর থেকে ও আমাদের নিচ থেকে এবং সর্বদিক থেকে ও সর্বাবস্থায় আমাদেরকে হেফাজত করে যাচ্ছেন।
আলাহ তা'আলা বলেন:

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله (سورة الرعد١١)

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে। তারা আলাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রাদ ১১)
অতএব দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আমরা বলতে চাই যে, আলাহই আমাদের সংরক্ষণ কারী। তার লেখনী ছাড়া আসমান ও জমিনে কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
যেমন আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا (سورة التوبة ٥١)

বল, আলাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবে না। (সূরা তওবা ৫১)

জীবনদাতা :

নিশ্চয়ই যে খাদ্য আমরা খাই, তা শুনতে পায় না, দেখতে পায় না, নড়াচড়া করতে পারে না, শ্বাস প্রশ্বাস করে না, ঘুমায় না এবং জাগ্রত হয় না। অথচ এই খাদ্য যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন তা জীবন লাভ করে এবং সাথে সাথে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়। এমন ভাবেই সকল জীবজন্তুর খাদ্যের অবস্থা।
এমন কি পানি, মাটি ও বাতাসের উপাদানগুলোর অবস্থা অনুরূপ যা গাছ-পালা-তৃণ লতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আর যখন সেই উপাদানগুলো কোন গাছের কাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে তখন সেগুলো জীবন্ত হয়ে যায়। এই সমস্ত জীবন যা মানুষ, জীব জন্তু ও গাছ পালার মধ্যে প্রত্যেক দিন, প্রতিটা মূর্তে প্রবেশ করছে তা প্রমাণ করে যে, এগুলো জীবনদাতার তৈরী।
মানুষ অবশ্য প্রচেষ্টা করে জীবন সৃষ্টি করার ব্যাপারে কিন্তু তারা অকৃতকার্য হয়েছে। পরিশেষে গবেষকগণ জীবন সৃষ্টির অপারগতার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

يا آيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقو ذبابا ولو إجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا

لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز (سورة الحج ٧٣-٧٤)

হে লোক সকল। একটি উপমা দেয়া হচ্ছে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আলাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও পারবে না। এবং যদি মাছি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে এটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই না দুর্বল। তারা আলাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না আলাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা হজ ৭৩, ৭৪)
হাঁ! মানুষ আসলেই অপারগ ঐ জিনিস ফিরিয়ে নিতে যা তাদের থেকে মাছি নিয়েছে। কেননা মাছি কোন জিনিস নেয়া মাত্রই তাতে লালা মিশিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে তা এমন বস্তুতে রূপান্তরিত করে যা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না এবং তার দ্বারা আর কোন উপকার হাসেল করা সম্ভব হয় না।

''আলীম ''العليم

আমরা যদি জীবজন্তুর বাচ্চাগুলোর প্রতি চিন্তা করি তখন দেখতে পাই মায়ের উদরে চোখ সৃষ্টি করা হয়েছে তা ছিল গভীর অন্ধকার অথচ চোখ আলো ছাড়া দেখতে পায় না। এই রহস্যটি এটাই প্রমাণ করে যে, যিনি এই চোখ সৃষ্টি করেছেন তিনি ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে, এই বাচ্চাটি অনতিবিলম্বে এমন এক জগতে বেরিয়ে আসবে যেখানে রয়েছে আলোর ব্যবস্থা।

এমন ভাবেই ডিমের মধ্যে পাখির ডানা সৃষ্টি এটাই সাক্ষ্য বহন করে যে, নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই জানেন যে, এই পাখিটি কিছুদিন পরে হাওয়ার মধ্যে উড়ে বেড়াবে। অতএব জন্মের পূর্বেই তার জন্য ডানা সৃষ্টি করেছেন।
আর এমন ভাবেই প্রত্যেক সৃষ্টি বস্তুতে আমরা দেখতে পাই যে, তার জন্মের পূর্বে তার জিন্দেগীর বসবাসের যথা উপযুক্ত সব কিছুই প্রস্তুত করে দিয়েছেন।
আলাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ألا يعلم من خلق وهوا للطيف الخبير (سورة الملك ١٤)

সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা :

সৃষ্টিকর্তার গুনাবলীর মধ্যে এটাও যে, তিনি শ্রবণ করেন এবং তিনি দেখেন। আলাহ তা'আলা মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কে বললেন যখন তারা দু-জনে বললেন ঃ

''السميع البصير،،ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي ,قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري (سورة طه ٤٥-٤٦)

হে আমাদের রব! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদেরকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমা লজ্ঘন করবে। তিনি বললেন: তোমরা ভয় কর না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা ত্বাহা ৪৫-৪৬)।
পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত আছে:

يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا (سورة مريم ٤٢)

যখন ইব্রাহিম (আঃ) কে তার পিতা তাকে মূর্তি পূজা করার জন্য ডেকে নিল তখন তিনি বললেন: হে আমার পিতা যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না তুমি তার ইবাদত কর কেন? (সূরা মারইয়াম ৪২)।
কেন না প্রকৃত মাবুদ যিনি, তার পরিপূর্ণ গুনাবলী থাকা বাঞ্ছনীয় তার দর্শন ও শ্রবণ কোন সৃষ্টিজগতের সাথে সদৃশ নয়।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (سورة الشورى ١١)

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা-শুআরা-১১)।

''الرحمن،، পরম দয়ালু ও ''الرحيم،، করুণাময়

তুমি মায়ের দরদের দিকে লক্ষ্য কর, কেমন তার সন্তানের প্রতি দয়া-মায়া, স্নেহ ও করুণা চাই সে মহিলা হোক অথবা জীব জন্তুর মা হোক তাদের স্পষ্ট উৎসর্গ তোমার কাছে প্রকাশ পাবে। এমনকি একটি মুরগি তার ছানার বিপদের আওয়াজে সে ভয় পায় এবং যে তার বাচ্চার অনিষ্টের ইচ্ছা করে তার উপর আক্রমণ করে। নিজের জীবনের ভয় না করে তার বাচ্চাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই এই স্নেহ ও করুণা যার দ্বারা একটি ছোট্ট সৃষ্টি জীব তাকে রক্ষা করে এটা এটাই প্রমাণ করে ইহা দয়াময় ও করুণাময় আলাহর সৃষ্টি।
নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইলম তাঁর রয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাত, আসমান ও জমিন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর ইলম বেষ্টন করে আছে।
আলাহ তা'আলা বলেন ঃ

واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور , ألا يعلم من خلق وهوا للطيف الخبير (سورة الملك ١٣-١٤)

তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানে না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরা মুলক ১৩, ১৪)
মানুষের সামনে যা রয়েছে তা সে জানতে পারে এবং তার অতিবাহিত জীবনের কিছু সে স্মরণ রাখতে পারে আর এ ছাড়া যা কিছু রয়েছে সে ব্যাপারে মানুষ অন্ধ। কিন্তু আলাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের অতীতের আমলগুলো পূঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হিসাব করছেন। সমস্ত বিশ্বের অবস্থা রেকর্ড করে রাখছেন।
ফেরাউন মুসা (আঃ) কে বলল, যেমন কুরআন তা বর্ণনা করেছে:

قال فما بال القرون الأولي .قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي (سورة طه ٥١- ٥٢)

ফিরাউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? মুসা বললেন ঃ
এর জ্ঞান আমার রবের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃত হন না। (সূরা তাহা ৫১-৫২)

আলাহ তা'আলা এই জগতের গোপন ও সূক্ষ্ম জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন ঃ

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر و البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين (سورة الأنعام ٥٩)

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবী ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন। তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয় না। এমনি ভাবে কোন সরস ও নীরস বস্তুও পতিত হয় না। সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আনআম-৫৯)

আমরা দেখতে পাই যে, মহান করুণাময় আলাহ তা'আলা মাটিকে জিন্দা করে তাকে বিভিন্ন প্রকার গাছ পালায় রূপান্তরিত করেন। এক একটি গাছের আকার আকৃতি এক এক প্রকার। সেগুলোর পাতা ডালপালা, কাণ্ড, ফুল ও ফলের এক এক রূপ। মাটি, পানি বাতাস ও একই সূর্যের আলোতে কত যে বাগান করেছেন যাতে রয়েছে রং বেরংয়ের সুন্দর মনোমুগ্ধ ফুল। এ সব কিছু এটাই প্রমাণ করে যে, এসব কিছু এক মহান স্রষ্টার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আমরা যদি খাদ্যের দিকে নজর করি। একই খাদ্য একটি পরিবারের খায়। সেই খাদ্য যখন পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে পুরুষ শরীর গঠিত হচ্ছে এবং মেয়ের শরীরের প্রবেশ করে মহিলার শরীর গঠিত হচ্ছে। বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে শিশুর শরীরে রূপান্তরিত হচ্ছে। অতঃপর যদি সেই খাদ্য বিড়ালে খায় তখন বিড়ালের শরীরে পরিণত হচ্ছে। এমন কি যদি তা ইঁদুর অথবা কুকুর খায় তবে ইঁদুর অথবা কুকুরের শরীরে পরিণত হচ্ছে। অথচ একই খাদ্য, এর কারণ হচ্ছে সেই মহান সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন রূপকার তিনি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে রূপদান করেন।

তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও :

মুসলমানদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। সৃষ্টি হচ্ছে নির্যাতনের নতুন নতুন ক্ষেত্র, বিস্তৃত হচ্ছে পরিসীমা। এর শেষ যে কোথায়? এ মুহূর্তে তা বলা কঠিন। মুসলমানরা পেরে উঠছে না বিধর্মীদের সাথে। অথচ আলাহ তা'আলা মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মোমিন হও। আলাহ পাকের এ চিরন্তন ঘোষণা সর্বকালের জন্য, সর্ব যুগের মু'মিনদের জন্য এ ঘোষণা সন্দেহ ও সংশয় পোষণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কেউ এরূপ করলে তার ঈমান থাকবে না। তাহলে মোমিনরা পেরে উঠছে না কেন? কেন তারা বিধর্মীদের হাতে মার খাচ্ছে? কেন তারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে? এসব বিষয় নিয়ে মুসলমানরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করেছে কি? চিন্তা করলে মূল কারণ অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হত।

আলাহ তা'আলা আমাদের বিজয়কে একটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর সেটা হ্চেছ মোমিন হওয়া। আমরাতো নিজেদেরকে ম'মিন বলে দাবি করি এবং বর্তমানে মু'মিনদের সংখ্যা অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। তারপরও তারা নির্যাতিত হচ্ছে। এর দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের ঈমানে ঘাটতি রয়েছে, ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং সেই ঘাটতি ও ত্রুটি দূর করে মুসলমানরা যদি ঈমানী শক্তিতে নিজেদেরকে বলীয়ান করতে সক্ষম হয়, তাহলে কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী সত্যিই তাদের বিজয় অনিবার্য। যুদ্ধে বিজয়ের জন্য জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তির প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে মুসলমানদের জন্য সবচে বড় শক্তি হচ্ছে তাদের ঈমানী শক্তি। ত্রুটিপূর্ণ ঈমান নিয়ে কেবলমাত্র অস্ত্রশক্তি ও জনশক্তি প্রয়োগ করে অথবা অভিনব রণ-কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদের পক্ষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা প্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তোমাদের মাতৃ গর্ভ হতে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হবে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। এতে একদিকে ছিল নিরস্ত্র, নিরন্ন ৩১৩ জনের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী, আর অপর পক্ষে ছিল আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত ও সর্বপ্রকার জীবনোপকরণ সামগ্রী সমৃদ্ধ ১০০০ জনের এক বিশাল বাহিনী। কৌশলগত দিক থেকেও যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তম স্থানটি ছিল প্রতিপক্ষের দখলে। এতকিছুর পরও আলাহর সাহায্যে মুসলমানরা সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে ঃ আলাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বদর যুদ্ধে, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল ও সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য। সুতরাং আলাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

মুসলমানরা তখন সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাদের ঈমান ছিল আকাশসম। তাই ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সামর্থ্যনুযায়ী যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তখন ত্বরিত গতিতে আল-াহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র বাহিনী ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করেছিল।

পক্ষান্তরে হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল ইতিপূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী। আর প্রতিপক্ষ ছিল মাত্র চার হাজার। সংখ্যাধিক্যের কারণে মুসলমানদের মনে ধারণা জন্মাল, আজ আমরা নিশ্চিতরূপে বিজয় অর্জন করব। কিন্তু প্রথমত ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মুসলমানরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল, ঠিক সে সময়ই প্রতিপক্ষের সৈন্যরা পাহাড়ের উপর হতে এমন অতর্কিত আক্রমণ শুরু করল যে, মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক পালাতে শুরু করল। শেষপর্যন্ত রাসূলুলাহ (সা.)-এর নিকট মাত্র কিছু সংখ্যক সাহাবী রয়ে গেলেন। তাদেরও মনোবাসনা ছিল যে, এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাসূলুলাহ্ (সা.) যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে প্রিয়নবী (সা.) হজরত আব্বাস (রা.) কে উচ্চস্বরে মুসলমানদেরকে আহ্বান করতে বললেন। তাঁর আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তুলল। পলায়নরত সাহাবায়েকেরাম ফিরে দাঁড়ালেন এবং আলাহর উপর ভরসা করে সাধ্যানুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এরপর আলাহ তা'আলা তাদের সাহায্যার্থে ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করলেন। মুহূর্তেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। শেষপর্যন্ত আলাহ তা'আলা উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

''আলাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তোমরা পলায়ন করেছিলে। এরপর আলাহ নাজিল করেন নিজের পক্ষ হতে সাকিনা তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন বাহিনী, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদেরকে এবং এটা হল তাদের কর্মফল।

উপরোক্ত দুটি ঘটনা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মুসলমানদের বিজয়ের অন্যতম হাতিয়ার হল তাদের ঈমানী শক্তি। ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে মুসলমানরা যখন বাতিলের মুকাবিলায়, তাগুতের প্রতিরোধে অবতীর্ণ হবে তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে আলাহর সাহায্য নেমে আসবে।

সুতরাং আজ বিশ্বব্যাপী যে মুসলিম নির্যাতন চলছে, মুসলমানরা যে গণহত্যার শিকার হচ্ছে, মুসলিম নারীর ইজ্জত যেভাবে হরণ করা হচ্ছে, মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, এরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য স্বয়ং মুসলমানরাও কিছুটা দায়ী। সুতরাং মুসলমানদের সেই হারানো গৌরব তথা অপরাজেয় ঈমানী শক্তি অর্জনে যথা শীঘ্র আত্মনিয়োগ করা উচিত। মুসলমানরা তা করতে পারলে সকল বাতিল শক্তি মূলোৎপাটিত হয়ে সমগ্র পৃথিবী মুসলমানদের পদানত হতে বাধ্য। বিজয় অবশ্যই তাদের পদ চুম্বন করবে। যারা এ আশা পোষণ করে যে, দ্বীনের পথ হবে নিষ্কণ্টক, সহজ ও বিপদমুক্ত, তারা মূলত ভুলের মধ্যে রয়েছে। কেননা বিপদাপদ এসে থাকে ইসলাম অনুসরণে একনিষ্ঠতার দাবিতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। এ জন্য আলাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ 'নিশ্চয়ই আলাহ তা'আলা জেনে নিবেন (প্রকাশ করে দিবেন) কারা সত্য বলেছে, আর কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। যারা সত্যবাদী, শত বিপদের সময়েও তারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকে। আর যারা মিথ্যাশ্রয়ী, বিপদের সময় তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়।

সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা তো আর দাবি করে প্রমাণ করার বিষয় নয় যে, ''আমার ঈমান ঠিক'' আমার দিল সাফ'' ইত্যাদি বাগাড়ম্বর দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। বরং সত্যবাদিতা হল কঠিন বাস্তবতা-যা প্রমাণিত হয় বাস্তব জীবনে বিপদ ও মুসিবতের মুখোমুখি হলে।

এ বিপদ দু' ধরনের হয়ে থাকে, ছোট ও বড়। দ্বীনের উপর চলতে গিয়ে পরিবারস্থ লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দিক থেকে যে সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো ছোট বিপদ। আর জেল, জুলুম, হত্যা, নির্যাতন, নাগরিকত্ব হরণ ইত্যাকার মুসিবত হল বড় বিপদ। ছোট হোক, আর বড় হোক-দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাধা-বিপত্তি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। এসব বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে এবং দুঃখ-যাতনা জয় করেই অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার জন্য সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা দ্বীনের পথ হল কণ্টকময়, বন্ধুর। স্বয়ং রাসূল সাল-ালাহ আলাইহি ওয়া সালাম এরশাদ করেন: 'জাহান্নামকে প্রবৃত্তির কামনা দ্বারা, আর জান্নাতকে কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে।' (বুখারী-২/৯৬০)

অর্থাৎ যে সব কর্মের পরিণতিতে মানুষ জাহান্নামে যাবে, তার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও মনোগ্রাহী। নফস বা প্রবৃত্তি এগুলোকে খুবই পছন্দ করে। এজন্য জাহান্নামের পথ অতি সহজ। আর যে সব কর্মগুণে

মানুষ জান্নাতের অধিকারী হবে, সেগুলো কঠিন ও কষ্টকর। প্রবৃত্তি কখনো তা করতে চায় না। এজন্য জান্নাতের রাস্তা কঠিন ও বিপদসংকুল। তাই জান্নাতের প্রত্যাশী ঈমানদারদের বিপদাপদে মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, ঈমানের দুর্বলতার কারণেই তারা তথাকথিত পরাশক্তির সামনে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে। অথচ তারা যদি আলাহ তাআলার অসীম শক্তি ও অগণিত দৃশ্য বাহিনীর কথা চিন্তা করতো যার হিসাব একমাত্র আলাহই ভাল জানেন,রক তাহলে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হত যে, আলাহর নির্দেশে সামান্য একটি ভূমিকম্পই মেক্সিকো ও সানফ্রান্সিসকো'র মত জৌলুসপূর্ণ শহরকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। আলাহর নির্দেশে তাদের তৈরী আণবিক বোমা তাদের দিকেই বুমেরাং হতে পারে। ''চেরনোবিল'' এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আজও তাদের হৃদকম্পন সৃষ্টি করে, যে ঘটনায় নিহত হয়েছিল অসংখ্য বনী আদম। এ ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা এই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে যে, কীভাবে অমানবিক শক্তির বিস্তার রোধ করা যায়।

সুতরাং মুসলিমদের এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আমাদের জন্য আলাহর অসংখ্য বাহিনীই যথেষ্ট যে বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার সাধ্য কোন পরাশক্তির নেই।

তথাপি আলাহকে নির্দেশ পালনার্থে আসবাব গ্রহণ ও বৈষয়িক শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে হবে। তবেই আল-াহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে থাকবে।

এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই (২:২)

মহাজ্ঞানী আলাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ গ্রন্থ। (৪০:২)

সন্দেহ নেই ইহা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (১০:৩৭)

এই কিতাবে আমি কোন কিছু লিখতে বাদ দেইনি (৬:৩৮)

তারা কি আল-কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? এটা যদি আলাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। (৪: ৩৭)

তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত তাঁর বাণী যা কেউই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রয়েছেন। (৬:১১৫)

তথ্য সংগ্রহ (বাংলা)

৭৮. আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ। (মহাকাশ পর্ব ১) কাজী জাহান মিয়া, মদীনা পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ আগস্ট-১৯৯৭

৭৯. আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ। (মহাকাশ পর্ব ২) কাজী জাহান মিয়া, মদীনা পাবলিকেশন্স ৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ মার্চ ২০০১

৮০. কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব। বিগ-ব্যাংগ মোহাম্মদ-আনওয়ার হুসাইন, দ্যা ডিভাইন লাইট পাবলিকেশন্স, পাথাওতলী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং

৮১. কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল। মোহাম্মদ আনওয়ার হুসাইন দ্যা ডিভাইন লাইট পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০০১ ইং

৮২. কোরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান। মুহাম্মদ শাহজাহান খান, সুলেখা প্রকাশনী ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০০ ইং

৮৩. কোরআনে বিজ্ঞান। ৬. মুহম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম, হা-মীম প্রকাশনী ১২১ বড় মগবাজার, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৬

৮৪. কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান। মুহম্মদ শফী-উলাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৯৯

৮৫. অভিযোগের জবাবে কুরআন ও বিজ্ঞান। ডা. শাহ মুহম্মদ হেমায়েত উলাহ্ গুলশান পাবলিকেশন্স ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

৮৬. কোরআন হতে বিজ্ঞান। শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, হাছানিয়া লাইব্রেরি ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৯ ইং

৮৭. কেন মুসলমান হলাম ? মাও আবুল বাশার জিহাদী, কুরআন-হাদীস রিসার্চ সেন্টার, দারুস সালাম মীরপুর ঢাকা, জুন ১৯৯৬ ইং

৮৮. আলাহর পরিচয় ও সৃষ্টির রহস্য। মুহম্মদ আজিজুর রহমান সুকী, ৩১৬ পূর্ব গোড়ান ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০০০ ইং

৮৯. যুক্তির কষ্টিপাথরে আলাহর অস্তিত্ব। খন্দকার আবুল খায়ের, জামেয়া প্রকাশনী ৬ প্যাবীদান রোড, বাংলা বাজার ঢাকা, ৭ম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৯
৯০. বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম, খামরুন প্রকাশনী, মগবাজার ঢাকা চতুর্থ প্রকাশ জুন ২০০০ইং
৯১. সুন্নতে রাসূল (স.) ও আধুনিক বিজ্ঞান। ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, আল কাউসার প্রকাশনী ৫০ বাংলা বাজার ঢাকা, রমজান ১৪২০ হিজরী।
৯২. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী। খন্দকার আবুল খায়ের জামেয়া প্রকাশনী ৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৪ ইং
৯৩. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম। ডা. মুহম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম আধুনিক প্রকাশনী নভেম্বর ১৯৯৭ বাংলা বাজার ঢাকা।
৯৪. বিজ্ঞান না কুরআন। মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মলিক, ব্রাদার্স, কলিকাতা ২০০১ ইং
৯৫. সুন্নত ও বিজ্ঞান। ডা. খন্দকার আব্দুল মান্নান কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার মীরপুর, ঢাকা, ১৯৯৭
৯৬. আল কুরআন থেকে আধুনিক বিজ্ঞান। সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ৩৬, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৯৭. তাফসীর মাআরিফুল কুরআন। মাও মুফতী শফি
৯৯. প্রজন্মের প্রহসন। মনিব উদ্দীন আহম্মদ
১০০. পত্র পত্রিকা
মাসিক মদীনা
মাসিক কাবার পথে
মাসিক সংস্কার
বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা

বাণী ও দোয়া

সেই মহান করুণাময় আলাহর সার্বিক প্রশংসা ও মহানবী (স.) এর উপর দরুদ ও সালাম। মহান স্রষ্টা আল-াহ তা'আলা জ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা মানব জাতির কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। আল-কুরআনের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে যেমন জ্ঞান অর্জন করার আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তেমনি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যাতে আমরা জগৎসমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করি। তাই বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে প্রতিটা সৃষ্টির মাঝে আলাহর অলৌকিক কুদরত ও নিদর্শন দেখতে পাচ্ছেন। মানুষের আহরিত জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। এই জ্ঞান পরিবর্তিত হয়, সন্দেহ মুক্ত নয়, বহুলাংশে মিথ্যা প্রমাণিত হয় যেহেতু মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আর আল-কোরআন হচ্ছে আলাহ প্রদত্ত ঐশী বাণী, সন্দেহ মুক্ত, মিথ্যার অবকাশ নেই, কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

আল-কুরআনকে সামনে রেখে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অভিনব তথ্যগুলোর সমন্বয় সাধন করে অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করে মোহাম্মদ ওসমান গনি রচিত 'আলাহর বাণী আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত তার লেখা 'ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান' এবং 'মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান' বই দুটি পাঠ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং আলার কাছে তার জন্য দোয়া করছি। এই বইগুলো বর্তমান আধুনিক সমাজে পাঠক বৃন্দের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আলাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
পরিচালক
আল-ফুরকান ফাউন্ডেশন

আলাহ তা'আলা বলেন, 'পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ কীভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। সূরা আনকাবুত ২৯ : ২০)

এসো পৃথিবীর দিকে নজর দেই। আলাহ তা'আলা বলেন,

তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্টি এবং অপরটি লবণাক্ত, উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (সূরা ফুরকান ২৫ঃ৫৩)

এসো সাগরের দিকে নজর দেই ।
আলাহ তাআলা বলেন, তোমরা দেখ আসমান ও পৃথিবীতে কি রয়েছে । (সূরা ইউনুস ১০ঃ১০১)
এসো আসমানের দিকে নজর দেই । আলাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের নফ্সের মধ্যেও (আলাহর অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে তোমরা কি দেখ না?) (সূরা জারিয়াত ৫১ঃ২১)
এসো আমরা নিজেদের মধ্যে নজর করি । আলাহ তা'আলা বলেন, হে মানুষেরা নিশ্চয়ই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য (আল্-কুরআন) সহ রাসূল আগমন করেছেন অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর । তা তোমাদের কল্যাণ হবে । (সূরা নিসা ৪ঃ১৭০) এসো আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করি ।

সমাপ্ত